"বসুমতী"র ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক,
লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

াণ-ল-হাউস
১৫, স্কোয়ার, কলিকাতা
১৩৪২

ছয় আনা

প্রকাশক—

৩৫এ, ফকির চক্রবর্ত্তী লেন,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে
ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেবার মত নেই

— চিত্র-শিল্পী —

শ্রীবলাইবন্ধু রায়   শ্রীসরসীকুমার রায়

শ্রীমুরারীমোহন ভড়

বিজ্ঞপ্তি

এই গল্পগুলির মধ্যে শিশুদের অদ্ভুত কল্পনাকে অব্যাহত রেখে কতকগুলি সুন্দর নীতি পরিবেষণের চেষ্টা করেছি। এখন বইখানি শিশুমহলে কিছু সমাদর পেলেই সকল শ্রম সার্থক মনে করব।

আর একটি কথা—নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় এ বইখানি এত শীঘ্র প্রকাশ করা একেবারেই সম্ভব হত না, যদি না সোদরপ্রতিম শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভড় এর সম্পাদনা ও সৌষ্ঠবসাধনের সকল ভার গ্রহণ করত। এজন্য তাকে আমি আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করছি। ইতি—৪ঠা ভাদ্র জন্মাষ্টমী ১৩৪২ সাল।

গ্রন্থকার

অনুক্রম

রাক্ষসটা বিকট চীৎকার করে সাধুটিকে গ্রাস করবার চেষ্টা করছিল।

—"মায়াকুম্ভ

সপ্তদশ শতাব্দীতে
পরিবর্ত্তনের অভিনব নবন্যাস।
৩য় সংস্করণ, মূল্য এক টা

মেঘনাথ

(ক)

এক ছিল রাজা।

সৈন্য-সামন্ত নিয়ে একদিন তিনি বেরুলেন মৃগয়া করতে। নানারঙের এক হরিণ দেখে তার পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। হরিণ বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। রাজা দিশেহারা হ'য়ে এদিক ওদিক চাইছেন, এমন সময় রাজার কানে একটা কান্নার সুর ভেসে এল।

রাজা হরিণের কথা ভুলেই গেলেন। যেদিক থেকে কান্নার শব্দ আসছিল, সেই দিকে খানিকটা এগোতেই দেখতে পেলেন, একটি সুন্দরী কন্যা একা বসে কাঁদছে। রাজা তার কাছে গিয়ে বললেন,—"কে তুমি? বনের মধ্যে একা কাঁদছ কেন?"

মেয়েটি হঠাৎ চমকে উঠে খানিকক্ষণ কান্না থামাল। কিন্তু আবার কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল,—"এই বনের ওপারে যে রাজ্য আছে, সেখানকার রাজার আমি মেয়ে। রাজকন্যা হয়েও নিজের বলতে আমার কেউ নেই। মা আমার স্বর্গে গেছেন। বিমাতা আমায় দু'চোখে দেখতে পারেন না।—তাঁরই হুকুমে, তাঁরই লোকজনেরা, আমাকে এই বনের মধ্যে বাঘ-ভালুকের মুখে ফেলে দিয়ে গেছে; এর চেয়ে তিনি যদি আমাকে শূলে চাপাতেন, তাহ'লে বরং হ'ত ভাল"।

রাজকন্যা মুখটি নীচু ক'রে অঝোর ঝরে কাঁদতে লাগল।

রাজার মনে দয়া হ'ল। তিনি মধুর স্বরে বললেন,—"কেঁদ না, চুপ কর। আমি যখন এসে পড়েছি, তখন বাঘ ভালুকের মুখ থেকে তোমায় বাঁচাব। এখন অন্ধকার হ'য়ে এসেছে—আজ আর পথ দেখতে পাব না। কাল সকালে এই বন পার হ'য়ে তোমাকে তোমার পিতার কাছে রেখে আস্‌ব। এবং অনুরোধও ক'রে আস্‌ব, যাতে ভবিষ্যতে তোমার বিমাতা এরকম নৃশংস অত্যাচার আর না করতে পারেন, সে বিষয়ে তিনি যেন দৃষ্টি রাখেন।"

রাজার কথা শুনেই রাজকন্যার মুখ শুকিয়ে গেল। খুব কাতর স্বরে রাজকন্যা বলল,—"দোহাই আপনার! আমাকে আর বাড়ীতে রেখে আসবেন না! সৎমা আমায় দেখলে আছড়ে আছড়ে মেরে ফেলবে।"

রাজা রাজকন্যাকে হাত ধ'রে তুলে বললেন,—"ভয় নাই ওঠ। আমি যখন অভয় দিয়েছি, তখন যে রকম ব্যবস্থা তুমি চাইবে, তাই হ'বে। তোমায় আমি এখন আমার রাজ্যে নিয়ে যাব।"

পরদিন ভোর হ'তে না হ'তেই রাজকন্যাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে রাজা দেশে ফিরে এলেন।

শেষে একদিন খুব ধুমধামের সহিত রাজা রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন।

রাজা আর রাজকার্য্য দেখেন না। সমস্ত ভার মন্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে নতুন রাণীর খেয়াল মত চলতে লাগলেন। নতুন রাণী যেন হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা—রাজা যেন তাঁর হাতের পুতুল।

বড়রাণী ও রাজকুমারকে রাজা আর চেয়েও দেখেন না। নতুন রাণীর আদেশে রাজা তাদের রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। যে রাজকুমার রাজার চোখের মণি ছিল, সে এখন চোখের বিষ হ'য়ে দাঁড়াল। বড়রাণী রাজার বাগানের এক কোণে ছোট একটা কুঁড়ে ঘর বেঁধে রইলেন। দুঃখে কষ্টে কোন রকমে দিন কাটে। দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ ক'রে মায়ের চোখ জলে ভ'রে যায়। মায়ের কষ্ট দেখে কুমারও নিরালায় কত কাঁদে। কিন্তু কই, দুঃখ ত তাদের দূর হয় না! কোন উপায়ই ত দেখা যায় না! এমনি ক'রে কতদিন তারা কাঁদবে?

একদিন রাজা শুনলেন, তাঁর সব চেয়ে সেরা সাদা ঘোড়াটিকে ঘোড়াশালে আর দেখা যাচ্ছে না। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন,—"মন্ত্রী, বসে বসে আরাম উপভোগ করবার জন্য তোমরা কি রাজসরকারে নিযুক্ত হ'য়েছ। যাও, চতুর্দ্দিকে লোক পাঠিয়ে দেখ, আমার ঘোড়াটি কে নিয়েছে—কার ঘাড়ে এত রক্ত আছে ?"

কে তুমি? বনের মধ্যে একা কাঁদছ কেন?

মন্ত্রী "যে আজ্ঞা" ব'লে অবনত মস্তকে প্রস্থান করলেন। সারা রাজ্য তোলপাড় হ'ল—কিন্তু কোথাও ঘোড়াটিকে দেখা গেল না। মন্ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে রাজবাড়ীর সকল লোকের প্রাণ ধুক্ ধুক্ করতে লাগল।

অপরাহ্ণে রাজা ও নতুন রাণী উদ্যানে বেড়াতে বেরুলেন। উদ্যানের পথে রক্তরেখা

দেখে রাজা ও নতুন রাণী চমকে উঠলো। সেই রক্তরেখা ধ'রে এগিয়ে যেতে যেতে শেষে বড়রাণীর কুঁড়ে ঘরের দরজার কাছে এলেন। একি! এখানে যে রাজার ঘোড়াটীর অর্দ্ধেক অঙ্গ পড়ে র'য়েছে! কে যেন ঘোড়াটীর পিঠে তলোয়ারের চোপ দিয়ে দুখানা করেছে। পিছনের অঙ্গ কিন্তু সেখানে নেই। রাজা এই দৃশ্য দেখে রাগে দুঃখে হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়লেন।

নতুন রাণী বললেন,—"মহারাজ, মনে হয়, বড়রাণীর উপদেশে—"

রাজা তা' যেন পূরণ ক'রে বললেন,—"কুমারের কীর্ত্তি।"

কুঁড়ে ঘরের মধ্য থেকে মূর্ত্ত অসহায়ের মত রাজকুমার বেরুল।

রাজা গর্জ্জন ক'রে উঠলেন —"কুমার!" রাজার চোখ থেকে যেন আগুন বেরুতে লাগল।

রাজকুমার পিতার পা দুটি ধ'রে বলতে লাগল,—"বাবা, ক্ষমা করুন। মা মধ্যরাত্রি থেকে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছেন। এখনও তাঁর জ্ঞান ফেরেনি।"

রাজা ও নতুন রাণীর উভয়ের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। রাজা কুমারকে পদাঘাত করলেন। কুমার 'মা' ব'লে চেতনাহীন মায়ের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল।

রাজার আদেশে তখনই সেপাই-সান্ত্রী এল। জ্ঞানশূন্যা বড়রাণীকে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। আর রাজকুমারকে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করলেন।

রাজকুমার মনের দুঃখে চলেছে ত চলেছে। দিন নাই, রাত নাই, কেবলই চলেছে। কোমল তার পা দুটি যেন আর চলতে চায় না। পদ্মের মত সুন্দর মুখখানি তার শুকিয়ে যায়। মনের মধ্যে অসহায় মায়ের কথা গুমরে গুমরে ওঠে—চোখ ফেটে ধারা বয়। গ্রামের মেয়েরা বলে, "আহা বাছারে!" বুড়োরা শুনে বলে, চুপ চুপ, রাজা শুনলে আমাদের আস্ত রাখবেন না! মেয়েরা তখন কোন এক অজানা ভয়ে চম্‌কে ওঠে,—চুপ করে। ছেলেরা বলে,—"চাইনা এমন রাজা। যার প্রাণে দরদ নেই, সে আবার কিসের রাজা!" ছোট্ট একটি ফুটফুটে মেয়ে হাতে একটা ফল নিয়ে বলে,—"খাবে!" রাজপুত্র থমকে দাঁড়ায়,—হাতও পাতে। কিন্তু সান্ত্রী ব্যস্ত হ'য়ে বলে,—"না না, নতুনরাণীর আদেশ নেই।" সান্ত্রী মেয়েটির হাত থেকে ফলটি কেড়ে নেয়। মেয়েটি তখন ভয়ানক কাঁদতে থাকে,—কি যেন তার হারিয়েছে। সান্ত্রীর চোখও শুক্‌নো থাকে না। নিজের মনেই সে বলে,—"কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য, রাজসরকারের প্রতি কর্ত্তব্য! নতুনরাণীর আদেশ।" এমনি করে রাজ্যের সীমানা শেষ হ'য়ে আসে। রাজকুমার সীমানা পেরতেই সীমানার ফটক বন্ধ হ'ল।

(খ)

বনের অন্ধকারকে আরো কালো ক'রে রাত্রি ঘনিয়ে এল। এত অন্ধকার রাজপুত্র কখনও দেখেনি। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস হু হু ক'রে বয়ে যাচ্ছে। দূরে হিংস্র পশুদের গর্জ্জন

একি! ঘোড়াটির অৰ্দ্ধেক অঙ্গ পড়ে র'য়েছে।

শোনা যাচ্ছে। রাজপুত্র হতভম্বের মত সেই দারুণ বিভীষিকার মধ্যে বসে রইল—এগিয়ে যে একটা আশ্রয় খুঁজে নেবে, তাও সে পারল না।

হঠাৎ রাজপুত্র দেখতে পেল,—খুব দূরে যেন একটা ক্ষীণ আলো তার দিকে ছুটে আসছে। ক্রমে ক্রমে আলোটি উজ্জ্বল হ'তে লাগল! রাজপুত্রের মনে হ'ল কে যেন তার

দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। রাজপুত্র ভাবলে হয় তো তার নতুন মার কোন গুপ্তচর তাকে হত্যা করতে আসছে। রাজপুত্র ভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। কিন্তু হায়, রাজপুত্র যেখানে লুকিয়েছিল, ঠিক সেই খানেই এসে লোকটি থামল। তার হাতে একটা উজ্জ্বল মণি। স্নিগ্ধ আলোয় রাজপুত্র দেখ্‌ল, এ তো নতুনরাণীর গুপ্তচর নয়। ইনি পিতৃতুল্য শস্ত্রগুরু। তিনি বললেন,—"রাজপুত্র, এখনি আমার ঘোড়ায় চড়। এই বনটি যত শীঘ্র পারি, আমাদের পার হ'তে হ'বে। তা না হ'লে, তোমার জীবন-সংশয়।" রাজপুত্র চমকে উঠ্‌ল। আর কোন কথা না বলে সে ঘোড়ায় চড়ে বস্‌ল।

সেই মণিটি ভীষণ অন্ধকারকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, স্নিগ্ধ আলোয় তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

অন্ধকার বন পার হ'য়ে আর এক রাজ্য। রাজকুমার আর শস্ত্রগুরু সেখানে এক বৃদ্ধার গৃহে অতিথি হলেন। আহার শেষে শস্ত্রগুরু বললেন,—"কুমার, তোমার ও রাণীমার দুঃখকষ্ট আর রাজ্যের অধঃপতনের কারণ কি তুমি জান?" কুমার বলল,—"জানি এ হ'চ্ছে নতুনমার যাদু।"

শস্ত্রগুরু যেন অবাক হ'য়ে বললেন,—"যাদু! এরকম মনে করার কারণ কি, কুমার?"

কুমার ধীর স্বরে বলতে লাগল,—"সে দিন রাত্রে,—আমার নির্ব্বাসনের পূর্ব্ব রাত্রে, আমার কিছুতেই ঘুম আসছিল না,—মায়ের এত কষ্ট, প্রজাদের অমঙ্গল, রাজ্যের অনিষ্ট আর নতুনমার উৎপাতের কথা ভাবলে, ঘুম আসে না—আমি রাজ-উদ্যানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় দেখি, নতুন মা একা সেই উদ্যানে এলেন। আমি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। তিনি অশ্বশালার দিকে এগোতে লাগলেন। আমি তখন বটগাছের উপর উঠলাম—সেখান থেকে অশ্বশালার সবই দেখতে পাওয়া যায়। নতুন রাণী তখন একটা বিকট রাক্ষসীর আকার ধারণ করলেন এবং পিতার প্রিয়তম শ্বেতাশ্বকে ভক্ষণ করতে লাগলেন। রাক্ষসী ঘোড়াটির দেহের পশ্চাদ্‌ভাগ খেয়ে,—সম্মুখ ভাগটি মায়ের কুঁড়ে ঘরের সামনে রাখল। তারপর রাক্ষসী মানবীর মূর্ত্তি ধারণ ক'রে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। আমি গাছ থেকে নেমে, মাকে জাগিয়ে এই বীভৎস কাহিনী বললাম। কিন্তু মা আমার ক্রমশঃ ভীত হ'য়ে জ্ঞানশূন্য হ'লেন। তাঁর সজ্ঞান অবস্থা আর আমি দেখতে পেলাম না।"

রাজকুমার কাঁদতে লাগল। শস্ত্রগুরু যে কিছু জানতেন না, তা নয়,—তিনি সবই জানতেন,—তবে এ সময় অধীর হ'য়ে পড়লে, পাছে সব দিক নষ্ট হয়, সেই ভয়ে তিনি রাজকুমারকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—"রাজকুমার, অধীর হ'য়োনা। রাণীমা জীবিত, তবে তিনি কারাগারে বন্দী। কিন্তু এটুকু তুমি জেনে রাখ, তাঁর কোনরূপ অনিষ্ট কেউ করতে পারবে না। আর নতুনরাণী মানবী নয় রাক্ষসী,—ইহা সত্য। সুন্দরী মেয়ের রূপ ধ'রে, রাক্ষসী মায়ায় মহারাজকে মুগ্ধ ক'রে, যা ইচ্ছে তাই করছে—আমি তা আগে থেকেই জানতাম।"

রাজপুত্র অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে বলল,—"আপনি যদি আগে থেকেই জানতেন,—তবে এ কথা আমাদের জানাননি কেন?"

গুরু বললেন,—"বৎস, সকল ঘটনাই সময় সাপেক্ষ। আমি যদি আগে থেকে তোমাকে জানাতাম, তাহ'লে কোনো ফল হ'ত না; বরং অনিষ্ট ঘটত। যাই হোক, সেই সময় আজ এসেছে,—আর রাক্ষসীর উচ্ছেদও তোমারই হাতে। এখন তোমাকে কতকগুলো দুঃসাহসিক কাজের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে।"

রাজপুত্র বট গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

রাজপুত্র উৎসাহে অধীর হ'য়ে বলল,—"বলুন কি করতে হ'বে? এ রাক্ষসীর উচ্ছেদে যে কোন কাজ করতে আমি কখনও বিমুখ হ'ব না।"

শস্ত্রগুরু রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন,—"কুমার, তোমার উৎসাহ জয়যুক্ত হোক্।"

রাজকুমার ও শস্ত্রগুরু যে বৃদ্ধার গৃহে অতিথি হয়েছিলেন সেই বৃদ্ধাও তাহাদের

কথাবার্ত্তা শুনছিল। সে তখন একটি ফুলের কুঁড়ি এনে বলল,—"রাজকুমার, সকলের আগে এই কুঁড়িটি আপনাকে উপহার দিতে চাই।"

রাজকুমার বৃদ্ধার কাছ থেকে কুঁড়ি নিল। কিন্তু একি! কুঁড়িটি যে ক্রমশঃ ফুটতে থাকে। ক্রমে একটি প্রকাণ্ড যূথি হ'য়ে উঠল। এতবড় যূথি সচরাচর দেখা যায় না। তার পাপড়িগুচ্ছের মধ্যে কিসের যেন একটা ছবি ভেসে উঠল। রাজপুত্র বিস্মিত হ'য়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

বৃদ্ধা বলল,—"কুমার কি দেখছেন ?"

রাজপুত্র বলল,—"একটি সুন্দরী রাজকন্যার মুখ।"

বৃদ্ধা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে, রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলল,—"কুমার, এই রাজ্যের নাম ধারা। একদিন ছিল, যখন রাজ্যের সকল লোক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের ধারায় জীবনের দিনগুলি ভাসিয়ে দিত। কিন্তু যেমন নদী স্রোত হারালে পর শৈবালদামে আচ্ছন্ন হয়, তেমনি যেদিন এই ধারা-রাজ্যের ঘুমন্ত রাজকন্যাকে পালঙ্ক শুদ্ধ কে চুরি ক'রে নিয়ে গেল, সেইদিন থেকে ধারা-রাজ্য আনন্দের মুক্ত স্রোত হারিয়েছে—দুঃখের অপার সাগরে ডুবে রয়েছে। তারপর একদিন, এক সন্ন্যাসী এসে আমার হাতে এই ফুলের কুঁড়িটি দিয়ে যান, বলে গেছেন, "যার হাতে এই কুঁড়িটি ফুটে উঠবে এবং এর মধ্যে রাজকন্যার মুখচ্ছবি দেখবে—সেই রাজকন্যাকে ফিরিয়ে আনবে। তখন ধারা-রাজ্যে আনন্দের স্রোত আবার বইবে। গাছে গাছে আবার ফুল ফুটবে, কুলায় কুলায় আবার পাখী গান গাইবে, রাজা-রাণীর মুখে হাসি আবার ফুটে উঠবে। রাজকুমার, সেইদিন আজ এসেছে।"

(গ)

পরদিন সকালবেলা।

রাজপুত্র ও শস্ত্রগুরুকে এখনি যাত্রা করতে হবে।

বৃদ্ধা, রাজপুত্রকে বলল,—"ফুলটিকে হারাবেন না কুমার! এই ফুলই আপনাদের পথের সন্ধান দেবে।"

তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন। নগরপ্রান্তে এসে ঘোড়াটাকে বনের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। মায়াবলে শস্ত্রগুরু এক পক্ষীরাজ ঘোড়ার রূপ ধারণ ক'রে রাজপুত্রকে পিঠের উপর উঠিয়ে নিয়ে আকাশ পথে উড়ে চললেন।

কত পাহাড় পর্ব্বত, গাছপালা, নদনদী পার হ'য়ে তারা চলেছে। পথের আর শেষ নেই। সূর্য্য তার দৈনিক ভ্রমণ শেষ ক'রে দিগন্তের অন্তরালে চলে গেল।

রাজপুত্র দেখল,—পশ্চিমাকাশের রাঙা আলো যেন ফুলটির উপর পড়েছে। রক্তাক্ষরে যেন তার সাদা পাপড়ির উপর লেখা আছে—"থাম"। ক্রমে সেই লেখা মিলিয়ে গেল। রাজপুত্র বলল,—"ফুল বলছে, আমাদের এখানে থামতে হ'বে।" তারা তখন মাটিতে নামল। নেমে দেখে, সামনেই একটা প্রকাণ্ড গাছ, তার বেড় অন্ততঃ পঁচিশ হাতের কম নয়। ভেতরটা সব ফাঁপা—কিন্তু সজীব। কোটরের মধ্যে ঢোকবার পথে কাঠের দরজা জানলা আঁটা—মনে করলেই খোলা যায়। তার মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ বাস করে। রাজকুমার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। কারও সাড়া শব্দ পেল না। পক্ষীরাজ ঘোড়া গাছের গুঁড়িতে একটা কামড় দিতেই সেখান থেকে রক্ত পড়তে লাগল। রাজকুমার এই ব্যাপার দেখে অবাক হ'য়ে গেল। পক্ষীরাজ ঘোড়া বলল,—"এই গাছ থেকে রস না বেরিয়ে যখন রক্ত বেরিয়েছে, তখন জান্‌তে হ'বে, এই কোটরে যে বাস করে, সে আমাদের শত্রু।"

পক্ষীরাজ ঘোড়ার রূপ ধারণ করে···।

ক্রমে সেই রক্ত টস্ টস্ ক'রে মাটিতে পড়তে লাগল। তখন পক্ষীরাজ ঘোড়া বলল,—"মাটিতে রক্ত পড়ছে—এই কোটরবাসী শত্রুর মৃত্যু তা' হলে আমাদেরই হাতে।"

পক্ষীরাজ ঘোড়া বলল,—"রাজপুত্র! রাত্রিটা আমাদের এইখানেই থাকতে হবে। তুমি কোটরের মধ্যে বিশ্রাম কর। আমি বাইরে রইলাম।"

শেষ রাত্রে একটা বিকট চীৎকারে দুজনেই জেগে উঠল। পক্ষীরাজ ঘোড়া রাজপুত্রকে ডেকে বলল,—"কুমার, একটা ভীষণ শব্দ শুনতে পাচ্ছ কি? এটা একটা রাক্ষস। আমি

মায়াবলে ভীষণ অজগর সাপ হ'য়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে হিস্ হিস্ শব্দ করব—তখন তুমি বেরিয়ে এসে তরোয়াল দিয়ে রাক্ষসটাকে কেটে ফেলবে।"

রাক্ষসটা কাছে আসতেই একটি অজগর সাপ তাকে জড়িয়ে ধ'রে হিস্ হিস্ শব্দ করতে লাগল। রাক্ষসটা বিকট চীৎকার করে সাপটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু রাজপুত্র বেরিয়ে এসে তাকে কেটে ফেলল। রাক্ষসটার চেহারা অদ্ভুত! মুণ্ড ছাড়া আর সবই আছে। পেটের মধ্যেই এর মুখ, চোখ, দাঁত।

কাঠের দরজা জানালা আঁটা।

রাক্ষসটা মরবার সময় রাজপুত্রকে বলল,—"এই গাছের পশ্চিম দিকে গুঁড়ির উপরেই একটা ফুল দেখতে পাবে, তার নীচে মাটি খুঁড়লেই একটা তলোয়ার পাবে। সেই তলোয়ারের আশ্চর্য্য গুণ; এটা কাছে থাকলে কেউ তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না। সকলকে জয় করতেও তোমাকে বেগ পেতে হবে না।"

রাজপুত্র তখন সেই ফুলের নীচে খুঁড়তেই মণিরত্নখচিত একখানি তলোয়ার দেখতে পেল।

তলোয়ারখানি নিয়ে তারা পুনরায় যাত্রা করল। কিন্তু ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় উভয়েই কাতর হ'য়ে পড়েছে। পক্ষীরাজ ঘোড়া বলল,—"ফুলটার দিকে তাকিয়ে দেখ, কিছু দেখতে পাও কিনা।"

রাজকুমার ফুলের দিকে তাকাল। সত্যি, একটা আশ্চর্য্য রকমের তালগাছের ছবি। একটা গুঁড়িতে বারটা গাছ। ছবির নীচে ছায়ার মত যেন লেখা—"দক্ষিণে যাও।"

দক্ষিণে খানিকটা অগ্রসর হ'তেই তারা দেখতে পেল ফুলে-দেখা সেই তালগাছ।

তার পাশেই তারা একটা কূপ দেখে নেমে পড়ল। রাজপুত্র তার মাথার পাগড়ীর একদিকটা জলে ডোবাতেই কে যেন জলের ভেতর থেকে ভীষণ টান মারল। রাজকুমার তাল সামলাতে না পেরে কূপের মধ্যে পড়ে গেল।

জলের মধ্যে এক ভীষণ দৈত্য। সে রাজপুত্রকে ধরে ফেলবার আগেই কুমার রাক্ষসের দেওয়া তলোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করল। তার ভীষণ দীপ্তিতে দৈত্যটার চোখ ঝলসে গেল। সে তাড়াতাড়ি রাজপুত্রকে উপরে তুলে দিয়ে বলল,—"আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার দাস ;—আমাকে যা আদেশ করবেন, তাই করব।"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করল,—"তুমি কে?"

দৈত্য হাতজোড় করে বলল,—"আমি কূপদৈত্য। এই কুপে যারা জল নিতে আসে তাদের ধরে খাই।"

রাজকুমার তাকে অভয় দিয়ে বলল,—"তোমাকে দরকার হ'লে কি ভাবে ডাকব।"

দৈত্য তখন একটী সোণার পালক দিয়ে বলল,—"দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে কোন কূপের পাশে দাঁড়িয়ে এই পালকটী তিনবার নাড়ালে, আমি সেই কূপের মধ্যে দেখা দেব।"

রাজপুত্র বলল,—"আচ্ছা, এখন তুমি কিছু খাবার আর জল নিয়ে এস দেখি।"

দৈত্য চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সে প্রচুর খাবার ও জল নিয়ে এল। আহার শেষ হ'লে একটু বিশ্রাম করে রাজপুত্র দৈত্যকে ছেড়ে দিল

একটা গুঁড়িতে বারটা গাছ

পক্ষীরাজ ঘোড়া আবার উড়তে লাগল। মাঝে মাঝে রৌদ্রোজ্জ্বল মেঘ তাদের সর্ব্বাঙ্গে স্নেহশীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল। কখনও বা পর্ব্বতের সুউচ্চ চূড়া গুলো মাথা তুলে তাদের

উৎসাহ দিতে লাগল। কখনও বা রত্নগর্ভ সমুদ্র তার গুরুগম্ভীর গর্জ্জনের তালে তালে উত্তাল তরঙ্গগুলির খেলা দেখিয়ে তাদের চিত্ত-বিনোদনের চেষ্টা করছিল।

বহুদূর অগ্রসর হওয়ার পর হাঁফ ছেড়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া রাজপুত্রকে বলল,—"কুমার, আমি আর যেতে পারছি না কেন? দেখত, ফুল কিছু নির্দ্দেশ দিচ্ছে কিনা?" রাজপুত্র ফুলের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখল, শরৎকালের শিউলি ফুলের মত পবিত্র একখানি মুখচ্ছবি—তার মুখে চোখে যেন দুষ্টুমির হাসি।

আমি কূপ-দৈত্য।

রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়াকে নামতে বলল। নীচে নেমে পক্ষীরাজ ঘোড়া বলল,—"তাইত, এখানে এত কুয়াসা কেন? দাঁড়াও কোন বিপদ আছে কিনা দেখি।" এই ব'লে খুর দিয়ে সে মাটি খুঁড়তে লাগল। একটু খুঁড়তে না খুঁড়তেই জল বেরুলো। সে বলল,—"রাজপুত্র, এখানে কোন বিপদ নেই। আমাদের যাদুবিদ্যায় বলে, জল হচ্ছে জীবন; অগ্নি হচ্ছে মৃত্যু। এখন তুমি নির্ভয়ে এই কুয়াসা ভেদ করে যেতে পার।"

রাজপুত্র একাই কুয়াসার মধ্যে প্রবেশ করল। এমন কুয়াসা সে জীবনে দেখে নি। সে চলতে লাগল। ঘন কুয়াসায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, তবু মরিয়ার মত সে অগ্রসর হ'য়ে চলল। এমনি ক'রে কিছুক্ষণ হাঁটবার পর রাজপুত্র যেন স্বর্গের নন্দন-কাননে এসে পড়ল;—সেখানে কুয়াসার লেশ মাত্র নাই—পাতায় পাতায় রোদের খেলা, ফুলে ফুলে প্রজাপতির নাচ, শাখায় শাখায় পাখীর গান। রাজপুত্রের ভারি ভাল লাগছিল। এমন সময় পিছন থেকে কাহার যেন দুটী শীর্ণ শীতল হাত রাজপুত্র নিজের কাঁধের উপর অনুভব

করল। রাজপুত্র ফিরে দেখে, এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। বৃদ্ধ হা-হা করে হেসে রাজপুত্রকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর হঠাৎ রাজপুত্রের হাত থেকে ফুলটী কেড়ে নিয়ে ফুলের এক একটী পাপড়ি ছিঁড়ে রাজকুমারের চারদিকে ছড়াতে লাগল। রাজপুত্র ফুলটাকে হারাতে চায় না, সে বাধা দিতে লাগল। বৃদ্ধ হাসতে হাসতে বলল,—"কুমার, আমি সেই সন্ন্যাসী, যে বৃদ্ধাকে এই ফুলটী দিয়ে এসেছিল। একদিন ধ্যানভঙ্গে দেখি আমার সামনে এই ফুলটী পড়ে রয়েছে। ধ্যানে জানতে পারলাম, রাজকন্যাকে রাক্ষসরা যখন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখনই রাজকন্যা এই ফুলটী ফেলে দিয়ে যায়। এখানে মাটির নীচে রাজকন্যাকে রাক্ষসরা রেখে গেছে। পাছে রাক্ষসরা আবার এসে রাজকন্যার প্রাণ-হরণ করে, এই ভয়ে আমি এই কুয়াসার সৃষ্টি করি। এই কুয়াসা তুমি ছাড়া আর কেউ ভেদ করতে পারত না।"

বৃদ্ধ হা—হা করে হেসে······

ফুলের শেষ পাপড়িটী মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার মাটি সরে গিয়ে একটা সিঁড়ি দেখা গেল।

সন্ন্যাসী বলল,—"এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাও। দেখবে এক পরিত্যক্ত প্রাসাদ। সেখানেই একটা ঘরের মধ্যে রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে। ঘরের বাইরে দেখবে একটা টিয়াপাখী। এই পাখীটা তোমাকে কতকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে।"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করল,—"কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে? আমি তার উত্তরই বা কি দেব?"

সন্ন্যাসী তখন রাজপুত্রকে রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করবার এবং তাকে ঘুম থেকে জাগাবার উপায় বলে দিলেন।

রাজপুত্র ভাবতে লাগল তার পিতার রাজ্যের কথা—তাদের নতুনরাণীর কথা। সে ত নতুনরাণীর উচ্ছেদ সাধনের জন্যই এতদূর ভ্রমণ করেছে! কিন্তু তার উদ্দেশ্য ত সফল হ'ল না! সে এখন আর এক রাজ্যের রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে চলেছে! অথচ পিতার রাজ্যকে বিপদশূন্য করবার কোন উপায়ই ত সে করতে পারল না!

সোনার কাঠি রাজকন্যার মাথায় ঠেকাতেই

সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সন্ন্যাসীকে তার নতুনমার মৃত্যু-রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করবে স্থির ক'রে যখন সন্ন্যাসীর দিকে চাইল, তখন সন্ন্যাসী অদৃশ্য হয়েছে, কেবল দূর থেকে একটা হা হা শব্দ ভেসে আসছিল। দূর থেকেই সে শুনতে পেল,—"ভয় নেই, আগে রাজকন্যাকে উদ্ধার কর। রাজকন্যাই তোমাকে সকল কথা বলবে।"

রাজপুত্র আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

এ যেন মায়াপুরের রাজবাটী। সকল জিনিষ সাজান আছে—কিন্তু কোন লোকজন নাই। লম্বা হলঘরের মধ্য দিয়ে আর একটী ঘরের দরজার কাছে সে এল। ঘরের বাইরে সোণার দাঁড়ে একটী টিয়াপাখী নেচে নেচে, ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলছে—

"রাজার ঘরে রাণী হয়ে থাকব বারমাস।
হাতী ঘোড়া উট খেয়ে করব হাঁসফাঁস॥"

রাজপুত্র পাখীটার কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। সে শুনেছিল অনেক রাক্ষস রাক্ষসীর প্রাণ টিয়াপাখীর মধ্যে থাকে। এই পাখীগুলো না মরলে তারাও কখন মরে না। হয়ত এই পাখীটার মধ্যেও কোন রাক্ষসীর প্রাণ লুকানো আছে।

রাজপুত্র সামনে যেতেই পাখীটা বললে,—"কেগো তুমি ?"

রাজপুত্র সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশমত উত্তর করল, "আমি তোমার ছেলে,রাজকন্যাকে নিতে এসেছি।"

"তুমি যে আমার ছেলে—তার প্রমাণ।"

"কি প্রমাণ চাও ?"

"রাজকন্যার ঘরের মধ্যে ঢোকবার উপায় যদি তোমার জানা থাকে, তাহ'লে বুঝব, তুমি আমার ছেলে।"

রাজপুত্র এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, সেখানে একটা কাঠের দাঁড় রয়েছে। রাজপুত্র সেই কাঠের দাঁড়টাকে সোণার দাঁড়ের কাছে নিয়ে আসতেই পাখীটা কাঠের দাঁড়ের উপর উঠে বসল,—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজাও খুলে গেল।

ঘরের মধ্যে সোণার পালঙ্কে রাজকন্যা ঘুমুচ্ছিল। মাথার কাছে সোণার আর পায়ের কাছে রূপার কাঠি। সোণার কাঠি রাজকন্যার মাথায় ঠেকাতেই, রাজকন্যা যেন ঘুম থেকে উঠল। রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিজের পরিচয় দিয়ে সকল ঘটনা খুলে বলল।

রাজকন্যা বলল,—"অনেকদিন আগে আমার পিতা যখন মৃগয়ায় গিয়েছিলেন, সেই সময় একদিন এক নদীর ধারে একটি সুন্দরী মেয়েকে কাঁদতে দেখেন। মেয়েটির নাকি কেউ নেই। বিমাতা তাকে দেখতে পারে না। পিতা তাকে আমাদের প্রাসাদে নিয়ে আসেন। তাঁর কেমন সন্দেহ ছিল হয়ত মেয়েটি রাক্ষসী। তাই তিনি গোপনে তার উপর লক্ষ্য রাখলেন। তাঁর সতর্কতায় ভালই হ'ল। একদিন রাত্রে তিনি দেখতে পেলেন যে মেয়েটি একটি রাক্ষসীর মূর্ত্তি ধ'রে তাঁর প্রিয় সাদা হাতীটাকে খাচ্ছে। সেই রাত্রেই তাকে মেরে প্রাসাদ থেকে বের করে দেওয়া হ'ল। এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যই রাক্ষসরা আমাকে চুরি করে এনে এখানে লুকিয়ে রেখেছে। আমি কত কাঁদি ! আমাকে রাক্ষসেরা কত মারে ! কিন্তু একেবারে মেরে ফেলে না। তাহলে নাকি অপমানের প্রতিশোধ ভাল করে নেওয়া হয় না। পাছে পালিয়ে যাই, তাই রাক্ষসেরা বেরুবার সময় ঘুম পাড়িয়ে রেখে যেত। ফিরে এসে আবার জাগিয়ে দিত ; কিন্তু অনেক দিন হ'ল তারা আর আসেনি। হয়ত বা সন্ন্যাসীর কুয়াসা-সৃষ্টির জন্যই।

রাজপুত্র বলল,—"আমাদের নতুন রাণীর মৃত্যু হবে কি করে জান ?"

রাজকন্যা বলল,—"জানি। রাক্ষসদেরই বলতে শুনেছি আমাদের প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেবার পর রাক্ষসীটা তোমার পিতাকে বিয়ে করে খুব সুখেই আছে। এই পাখীটাই হচ্ছে তার প্রাণ। এটাকে রাক্ষসরা এখানে লুকিয়ে রেখে গেছে। কারণ এখানে নাকি কোন মানুষ আসতে

পারে না। পাখীটারও তাই কেউ কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এটাকে না নিয়ে গেলে নতুন রাণী মরবে না। কিন্তু এ পাখীকে এখান থেকে সরালেই পাখী এমন চেঁচাবে যে, যেখানে যত রাক্ষস আছে, তারা এখনি এসে আমাদের মেরে ফেলবে। রাক্ষসেরা একদিন বলাবলি করছিল যে, কোথায় এক কূপদৈত্য আছে, সেই কেবল এই পাখীকে নিয়ে যাবার উপায় জানে।"

রাজপুত্র পাখী-ওয়ালার বেশে

রাজপুত্র বলল,—"কূপদৈত্যের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। চল আমরা একটা কূপের কাছে যাই তাহ'লে সে আমাদের কাছে এসে হাজির হবে। তারা তাই করল। পালক নাড়তেই কূপদৈত্য এসে বলল,—"কুমার, কি আদেশ?"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করল,—"ঐ টিয়াপাখীকে নিয়ে যাবার উপায় কি?"

দৈত্য তখন রাজপুত্রকে আর একটি পালক এবং একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বলল,—"কুমার, এই পালকটি পাখীর গায়ে বুলিয়ে বুলিয়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন, তাহলেই পাখীটি আপনার বশীভূত হবে।"

দৈত্যের কথামত পাখীটিকে বশ করা হ'ল।

তারপর পাখীটাকে নিয়ে রাজপুত্র ও রাজকন্যা উপরে উঠে দেখল পক্ষীরাজ ঘোড়া তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তখনই তারা গৃহের পথে যাত্রা করল।

ধারা রাজ্যে ফিরে রাজপুত্র বৃদ্ধার গৃহে রাজকন্যাকে নামিয়ে দিল। রাজ্যময় আবার আনন্দের স্রোত বইল।

রাজপুত্র শস্ত্রগুরুর সঙ্গে পিতার রাজ্যে ফিরে এসে একা পাখীওয়ালার বেশে রাজপুরীর দিকে অগ্রসর হ'ল। তারপর রাক্ষসপুরীর টিয়াপাখীটাকে কাপড়ে ঢাকা একটা খাঁচায় পুরে রাজসভার দিকে চলল।

পথঘাট নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। সমস্ত রাজ্য যেন বিষাদ-সাগরে মগ্ন।

ধীরে ধীরে রাজপুত্র সেই কুঁড়ে ঘরটিতে এসে পড়ল,—যেখানে সে তার দুঃখিনী মাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে চলে গেছল—যেখান থেকে তার নির্ব্বাসন দণ্ড হয়। রাজপুত্রের অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গল। কিন্তু কাঁদলে কি হবে?

রাজপুত্র রাজসভায় এসে উপস্থিত হ'ল,—বিদেশী পাখীওয়ালার বেশে। পাখীওয়ালা বলল,—"মহারাজ, আমি একজন বিদেশী পাখীওয়ালা,—রাণীমার জন্য একটা সুন্দর পাখী সংগ্রহ করেছি। রাণীমাকে সেই পাখী উপহার দিতে এসেছি।"

রাজপুত্র খাঁচাটির আবরণ খুলে টিয়াপাখীটা বার করল। নতুনরাণী হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হ'য়ে পাখীওয়ালার দিকে ছুটে এল।

রাজপুত্র তখনি পাখীটার ঘাড় ভেঙ্গে দিল। নতুনরাণী বিকট রাক্ষসীর আকার ধারণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রাজপুত্র তখন নিজের পরিচয় দিয়ে সকল ঘটনা বিবৃত করল। সভার সকল লোক রাজপুত্রের জয়োচ্চারণ করল।

তার মুখে সকল ঘটনা শুনে রাজা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চোখের কোণে আনন্দাশ্রুর দুটি ফোঁটা চক্ চক্ করে উঠল। বড় রাণীকে তখনি কারাগার থেকে আনানো হ'ল। পুত্রকে বুকে নিয়ে তিনি রাজার দিকে চাইলেন। সজল চোখ দুটিতে তাঁর কত অভিযোগই না ফুটে উঠেছে। রাজার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। অশ্রুর ফোঁটা দুটি কেবল ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ল।

* * * * * *

তারপর রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে। বাঁশীর সুরে উভয় রাজ্যের আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল।
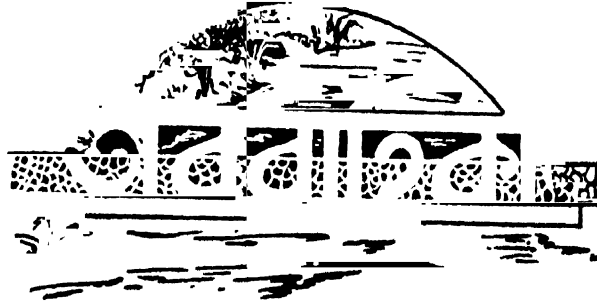
এক খামখেয়ালী রাজা তাঁর মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন,—"চিজ্-কো-চিজ্—জান্-কো-জান্—নিমক্-হারাম্—নিমক্-হালাল্ ; এদের উত্তর সাতদিনের দিনে চাই, না পেলে গর্দ্দান্ যাবে।"

মন্ত্রীর মাথায় যেন বাজ পড়ল। বাড়ীতে ফিরে এসে কা'কেও কিছু না বলে, একটা ঘরের কোণে বসে কাঁদতে লাগলেন।

এ কথা মন্ত্রীর স্ত্রীর কানে গেল। তিনি ছুটে এলেন, স্বামীর চোখে জল দেখে বল্লেন,—"কি হ'য়েছে ? কাঁদছ কেন ?"

পত্নীর প্রশ্নে মন্ত্রীর দুঃখ শতগুণ বেড়ে উঠল। অনেক কষ্টে সকল কথা তিনি স্ত্রীর গোচর করলেন। স্ত্রী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন,—"এর জন্যে ভাবনা কি ! তুমি স্থির হও ! আমি প্রশ্ন শুনেই সব উত্তর ঠিক ক'রে ফেলেছি !"

মন্ত্রীপত্নী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। কিন্তু পত্নীর আশ্বাস বাক্যে মন্ত্রীর ভয় গেল না। তিনি অধীরভাবে বল্লেন,—"কি বল দেখি ? কি ঠিক করলে ?" স্ত্রী বল্লেন,—"তুমি একটু স্থির হও ত। তারপর বলব।" কিন্তু মন্ত্রীর অস্থিরতা কিছুতেই গেল না।

সপ্তম দিনে রাজা, পাত্র-মিত্র নিয়ে রাজসভায় বসে আছেন, এমন সময়ে মন্ত্রী, পত্নীর উপদেশমত তাঁর গৃহজামাতা ও পোষা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে রাজার নিকট হাজির হলেন।

মন্ত্রীর সঙ্গে একটি যুবক ও কুকুরকে দেখে রাজা বিদ্রূপ ক'রে বল্লেন,—"তুমি কি আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করতে এসেছ ? জান, উত্তর ঠিক দিতে না পারলে কি সাজা পেতে হবে ?"

মন্ত্রী দুই হাত জোড় করে বল্লেন,—"জানি প্রভু ! আমি ব্যঙ্গ করতে আসি নি, উত্তর দিতেই এসেছি।"

রাজা সন্তুষ্ট হ'য়ে বল্লেন,—"বেশ, তবে কি উত্তর এনেছ দেখি ?"

আদেশ পেয়েই মন্ত্রী রাজার হাতে প্রথমে একটি সোনার কৌটা দিলেন, বল্লেন,—"মহারাজ ! এই আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর, চিজ্-কো-চিজ্।"

রাজা সাগ্রহে কৌটার ঢাকা খুল্লেন। ভেতরে মাটি দেখে বল্লেন,—"বাঃ ! চমৎকার উত্তর হয়েছে ! সত্যইত এই মৃত্তিকা হতেই জগতের সব জিনিষের উৎপত্তি,—সব চিজের ওপরেই ত এই চিজ, আর সোনার কৌটাটি এর ঠিক আধার হয়েছে !"

রাজা হেসে বল্লেন,—"তারপর।"

মন্ত্রী পুনরায় রাজার হাতে একটি রূপার কৌটা দিয়ে বল্লেন,—"এটি আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর,—"জান্-কো-জান্।"

রাজা এবারেও আগ্রহের সহিত কৌটাটি হাতে ক'রে ঢাকা খুল্লেন। তাতে জল দেখে তিনি ভারী খুসী হ'লেন, বল্লেন,—"বেশ, বেশ, অতি উত্তম ! এই জলেরই আর একটী নাম জীবন। এই জল খেয়েই সকলে বেঁচে আছে। তাই এ জলকে জান্-কো-জান্ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ? আর এই রূপার কৌটাটি ঠিক উপযুক্ত পাত্র হয়েছে। তারপর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর কি ঠিক করলে ?"

মন্ত্রী তখন তাঁর পাশের যুবককে দেখিয়ে বল্লেন,—"এই যে যুবককে দেখছেন, এটি আমার জামাতা। এর পৈত্রিক অনেক বিষয় ছিল, বাপ সব নষ্ট করায়, আমি আমার বাড়ীতে এনে রেখেছি। এত যত্ন করি তবু মন পাই না। এমন নিমক্‌হারাম্ আর দুটী নাই। তাই এই নিমক্‌হারাম্‌কে দেখাবার জন্যে আপনার কাছে এনেছি। ঠিক কি না সে বিচারের ভার আপনার ওপর।"

রাজা কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে থেকে বল্লেন,—"ঠিক বলেছ, এতে একটুও ভুল নাই। জামাই জাতটাই নিমক্‌হারাম্ ! তারপর ?"

মন্ত্রী তাঁর কুকুরকে দেখিয়ে বল্লেন,—"মহারাজ! যদি ঠিক নিমকের চাকর কেউ থাকে, তবে এই কুকুর জাতি। এদের দুটী খেতে দিলে, প্রাণ দিয়েও উপকার করে। এমন নিমক্‌হালাল

এই কুকুরই আপনার চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

আমি জীবনে কখন দেখিনি। অতএব এই কুকুরই আপনার চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।"

প্রশ্নগুলির উত্তরে অতিশয় সন্তুষ্ট হ'য়ে রাজা মন্ত্রীর প্রাণদান করিলেন বটে, কিন্তু কোপটা পড়ল মন্ত্রীর জামাইয়ের উপর। রাজা রাগে অধীর হ'য়ে, সভাস্থল কাঁপিয়ে বল্লেন,—"দেখ মন্ত্রী, তুমি জান, আমি চিরকাল নিমক্‌হারামের ওপর চটা। ও-গুলোকে দেখলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। এখন ঐ নিমক্‌হারাম্‌টাকে শূলে চাপিয়ে এ জগৎ থেকে সরিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হব। আমার হুকুম, আজ থেকে সাত দিনের দিন তুমি একটা শূল সঙ্গে ওটাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। না আনলে তোমাদের সকলকে শূলে চাপাব, কেউ বাদ যাবে না।"

হঠাৎ বাজ পড়লে মানুষ যেমন চমকে ওঠে, মন্ত্রী সেই রকম চমকে ভাবলেন, রাজার পায়ে ধরে জামাতার প্রাণ ভিক্ষা করেন, কিন্তু তাতে যদি রাজার রাগ বেড়ে যায়, এই ভয়ে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরলেন।

মন্ত্রীকে কাঁদতে দেখে তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন,—"কাঁদছ যে? রাজার প্রশ্নের উত্তর বুঝি ঠিক হয় নি?"

মন্ত্রী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বল্লেন,—"উত্তর ঠিক না হ'লে কি আজ আমার প্রাণ থাকত?"

মন্ত্রী-পত্নী বল্লেন,—"তবে?"

মন্ত্রী বল্লেন,—"খেয়ালী রাজা আমাকে ছেড়ে জামাইকে শূলে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।"

মন্ত্রীর স্ত্রী শঙ্কিত হ'লেও শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি রকম শুনি?"

মন্ত্রী বল্লেন,—"জামাই নিমক্‌হারাম্ শুনেই রাজা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। কথা নাই, বার্ত্তা নাই, একেবারে শূলের আদেশ দিলেন। সময় এবারের মতই সপ্তম দিনে। ঐ দিনে একটা শূল আর জামাইকে সঙ্গে নিয়ে রাজার কাছে যেতে হবে, না গেলে আমাদের সকলকে শূলে চাপানো হবে।"

আর এই সোনার শূলটি আপনার জন্য।

মন্ত্রীর স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"এতে ভয় কি আছে? রাজার স্বভাব খামখেয়ালী হ'লেও তাঁর যে বুদ্ধি আছে, তা তাঁর আজকের বিচারে বেশ বোঝা গেছে।"

পাঁচদিন কাটল। ষষ্ঠ দিনে মন্ত্রি-পত্নীর কথামত তিন ধাতুর তিনটি শূল প্রস্তুত হ'য়ে এল। একটি সোনার একটি রূপার ও একটি লোহার।

সাত দিনের দিন প্রাতে, মন্ত্রি-পত্নী স্বামীকে তিনটি শূল ও জামাই সঙ্গে রাজার নিকট পাঠালেন। মন্ত্রী রাজসভায় গিয়ে রাজার সামনে করযোড়ে দাঁড়ালেন। রাজা তিন ধাতুর

তিনটি শূল দেখে অবাক্ হ'য়ে বল্লেন,—"মন্ত্রী! তুমি কি কানে কম শোন? আমি তোমাকে একটা শূল আনতে বলেছিলুম, তুমি একেবারে তিনটে শূল নিয়ে এলে!"

মন্ত্রী, পত্নীর কথা মত বল্লেন,—"মহারাজ এই যে লোহার শূলটি দেখছেন, এটি আমার জামাতার জন্য; রূপার শূলটি আমার জন্য; আর এই সোনার শূলটি আপনার জন্য।"

মন্ত্রীর অদ্ভুত কথায় রাজা বিস্মিত হ'লেন। বল্লেন,—"কেন? আমাদের কি দোষ?"

মন্ত্রী বল্লেন,—"মহারাজ! আপনার বিশ্বাস যখন জামাই মাত্রেই নিমক্‌হারাম্ এবং নিমক্‌হারাম্‌কে শূলে বধ করাই যখন আপনার পণ, তখন আপনি ও আমিই বা বাদ যাব কেন? আমরাও ত কারও না কারও জামাই। তাই মান্য অনুযায়ী সোনা, রূপা ও লোহার তিনটি শূল এনে কিছু অন্যায় করিনি ত!"

মন্ত্রীর এই যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে রাজা ভাবলেন,—"সত্যই ত! মন্ত্রীর কথাই ত ঠিক! আমরাও ত কারও না কারও জামাই? কিন্তু মন্ত্রীকে এ যুক্তি দিলে কে?"

রাজা প্রশ্ন করলেন,—"দেখ মন্ত্রী, তোমার উত্তর শুনে খুসী হয়েছি সত্য, কিন্তু ঠিক ক'রে বল দেখি, এ বুদ্ধি তোমায় কে দিলে?"

মন্ত্রী সবিনয়ে স্বীকার করলেন,—"মহারাজ! জানেনই ত, আমি ক্ষুদ্র মানুষ। কিন্তু আমার স্ত্রী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। এ সমস্ত তাঁরই যুক্তি।"

রাজা হেসে বল্লেন,—"হুঁ। তোমাকে আমি চিনি কি না!"

এক ধনী তাঁর একমাত্র পুত্রের আদরের নাম রেখেছিলেন খোকন। খোকন যৌবনে পদার্পণ করবার দু-চার বৎসর পরে বাপ মারা যান। আর পায় কে! লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে মোসাহেব দল নিয়ে আমোদে মাত্‌লেন। গতরখানা যেন তূলোর বস্তা, পেটটা যেন মৈনাক পর্ব্বত, উঠ্‌তে বস্‌তে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। মেজাজ বড়ই খিট্‌খিটে; কারও সঙ্গে বনে না, কারও কথা মানেন না, নিজের গোঁ ধরেই থাকেন, তাঁর জন্য বাড়ীশুদ্ধ লোক সন্ত্রস্ত।

বাড়ীর বার বড় হন না। অষ্টপ্রহর মোসাহেব দল নিয়ে বৈঠকখানা সর্‌গরম ক'রে থাকতেন। তবে যে দিন বাড়ীর বার হতেন, সে দিন একটা পর্ব্বদিন বলে মনে হ'ত। হৈ—হৈ, রৈ—রৈ, ব্যাপার;—চাকর-বাকর, লোক-লস্কর, সরকার-গোমস্তা এমন কি পেয়ারের মোসাহেবগণ পরিবৃত হ'য়ে যেন দিগ্বিজয় কর্‌তে চলতেন।

বাইরে বেরুলে খোকন বাবুর মেজাজ অন্য রকম হ'য়ে যেত। যত কোপ পড়ত গরীবদের ওপর। রাগের কারণ, রসুই বামুন হরেক রকম রান্না বাটি ভরে দেয়, তা তাঁর কোনটা মুখে রোচে না, একটু খেলেই পেট দম্‌সম্‌, আর ওরা কি না কুঁড়ে ঘরের

দাওয়ায় বসে একটু নুন ও শাক চচ্চড়ি দিয়ে দেড় সের বুকড়ি চালের ভাত অম্লান বদনে খেতে থাকে, এ কি তাঁর সহ্য হয়? আরও রাগের কারণ, ধবধবে পালকের গদিতে শুয়ে তাঁর ঘুম

মো সাহেব দল নিয়ে বৈঠকখানা সরগরম করে…

আসে না, আর ওরা কি না ধূলোর ওপর চেটাই পেতে কুম্ভকর্ণের মত নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়, পাশ দিয়ে হৈ-চৈ ক'রে গেলেও ঘুম ভাঙে না, একটা নমস্কারও করে না! ওঃ! কি আস্পর্দ্ধা!

একদিন খোকনবাবু দলবল নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েচেন। দেখেন, এক কৃষক মোড়ল ধান কাটচে আর মনের আনন্দে গান গাচ্চে। সেই গরীব কৃষকের হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ দেখে খোকনের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠল, চীৎকার ক'রে বলে উঠল,—"কী! এত দম্ভ! এত অহঙ্কার! আমায় অগ্রাহ্য! একটা খাতির নাই! একটা নমস্কার নাই! আবার স্ফুর্ত্তি ক'রে গান! দুত্তোর চাষার নিকুচি করেচে!"

এই বলে রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে দলের লোকগুলোকে হুকুম দিলেন,—"ঐ বদ্‌মাস্‌ পাজী বেটার পিঠটা ফাটিয়ে দে ত! ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে দে ত।"

ঐ পাজী বেটার পিঠটা ফাটিয়ে দেত!

হুকুম পেয়ে খোকনের দল হৈ-হৈ ক'রে গরীবকে মেরে রক্তপাত ক'রে ক্ষেতে আগুন ধরিয়ে দিল,—নিমেষের মধ্যে পাকা ধান গাছগুলো পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। খোকন তাই দেখে মনের উল্লাসে দলবল নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। দরিদ্র মোড়ল রক্তমাখা পিঠ নিয়ে সাক্ষীসমেত রাজ দরবারে উপস্থিত হ'ল।

যথা সময়ে খোকনের ডাক পড়ল। খোকন, মোসাহেব সঙ্গে রাজার নিকট উপস্থিত হলেন। রাজা মোড়লকে দেখিয়ে খোকনকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"এ গরীবকে মেরে রক্তপাত ক'রে ক্ষেতে আগুন ধরিয়ে কি লাভ হ'ল? এ কি দোষ করেছে?

খোকন দম্ভ ক'রে বল্লেন,—"ও পাজী বেটার বড় বাড় বেড়েছে।"

"কি বাড় বেড়েছে,—মেরেছে?"

"না।"

"কেটেছে?"

"না।"

"অপমান করেছে ?"

"না।"

"তবে কি করেছে ?"

"আমার মান হানি করেছে।"

"কি রকম ?"

"আমি এত বড় একটা দিগ্‌গজ বড় মানুষ, যার দাপটে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খায়, ও বেটা চাষা, যার উদ্‌খেতে ক্ষুদ জোটে না, ও বেটা কিনা জোর ফলিয়ে আমায় একটা নমস্কার না করে গান জুড়ে দেয়! এ অপমান কি প্রাণে সহ্য হয় ?"

"ও কি তোমার খাতক ?"

"কিছু না।"

"তোমার প্রজা ?"

"কিছু না।"

"ওর সঙ্গে দেনা পাওনা আছে ?"

"কিছু না।"

"তবে ওর ওপর এত রাগ কেন ?"

"রাগ কেন জানেন, গরীব যে,—সে গরীবের মতই থাকবে, দুঃখ ধান্দাতেই দিন কাটাবে, আর বড়মানুষ দেখলেই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়বে। তার আবার স্ফূর্ত্তি কি! গান গাওয়া কি!"

রাজা একটু চিন্তা ক'রে বল্লেন,—"ওঃ! বুঝেছি! তুমি গরীবকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করনা, কেমন কি না ?"

"নিশ্চয়ই! ওরা আবার মানুষ কিসে? বড় মানুষের উমেদারি করবার জন্যেইত ওদের জন্ম! বড়মানুষ,—মারুক, ধরুক, কাটুক, এমন কি মেরে ফেল্লেও একটু টুঁ শব্দ করতে পারবে না, এই জন্যই ওদের জন্ম! ঐ দেখুন লোকটা এমন পাজী, একটু লেগেছে কি না লেগেছে, একটু রক্ত বেরিয়েছে কি না বেরিয়েছে, অমনি আপনার কাছে ছুটে এসে নালিশ রুজু করে দিয়েছে!"

কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে থেকে রাজা কি ভাবলেন, তারপর মোড়লের প্রতি ভ্রূকুটি নিক্ষেপ ক'রে বল্লেন,—"তুই বড় বদমাস্! তুই কি না গরীব চাষী হ'য়ে, এত বড় একটা দিগ্‌গজ

বড়মানুষকে তাচ্ছিল্য করিস্! তার সামনে গান গেয়ে অপমান করিস্! এ অপরাধের শাস্তি কি জানিস্—গর্দ্দানি! কিন্তু তোর এই প্রথম অপরাধ! তাই তোকে এ যাত্রা মাপ করলুম। ফের্ যদি বেয়াদবি দেখি তা হ'লে তোর মুণ্ডপাত করব!"

মোড়লকে ভর্ৎসনা করতে শুনে খোকনের মুখে হাসি আর ধরে না। আর তাঁর তাঁবের মোসাহেবদের ত কথাই নাই, তারা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল এবং বারবার রাজার প্রশংসা ক'রে গগন বিদীর্ণ করবার উপক্রম করল।

ইহাতে রাজার কিছুই পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। তাঁর মূর্ত্তি অধিক গম্ভীর ভাব ধারণ করল। দুই চোখ রক্তবর্ণ ক'রে খোকনকে বল্লেন,—"ওরে অহঙ্কারী পাপিষ্ঠ মূঢ়!—শোন্! এই দরিদ্র কৃষককে অকারণে নির্য্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছিস্, এজন্য তোর বিশেষরূপ শাস্তির দরকার হ'য়েছে! তাই তোকে পূর্ণ এক বৎসর আমার দ্বীপে জঙ্গল কাটাই কার্য্যে নিয়োগ করলুম্! যদি দেখি তোর মনের গতি বদলেছে তখন তুই আপনা হ'তেই ছাড়ান পাবি, তা না হ'লে ঐ খানেই পচে মরবি। গরীবের যা সর্ব্বনাশ করেছিস্, তার জন্যে নগদ পাঁচশ টাকা দণ্ড দিতে হ'বে।"

খোকনের মুখে হাসি আর ধরে না।

এই বলে রাজা আসন ত্যাগ করলেন।

রাজাজ্ঞা শুনে মোসাহেবদের হাসি-মুখ শুকিয়ে গেল, আর খোকনের ত কথাই নাই, তিনি কেঁদে বুক ভাসাতে লাগলেন।

রাজার আজ্ঞায় খোকন বন্দীভাবে প্রেরিত হলেন। সেখানে উপস্থিত হ'বামাত্র সর্দ্দার রাজার আজ্ঞামত অন্য অন্য মজুরদের সঙ্গে খোকনকে একখানি কুড়ুল দিয়ে একটা গাছ কাটতে আদেশ দিল, বল্ল,—"এই গাছ কাটা শেষ হ'লে তবে ছুটি।"

অন্য অন্য মজুরেরা দুই ঘণ্টার মধ্যে গাছগুলিকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেল্লে। তাদের গায়ে অসীম বল, এ কাজে তারা খুব অভ্যস্ত, কিন্তু খোকনের দুর্দ্দশার শেষ নাই।

তিনি গাছের গোড়ায় দু-চারটা কোপ মেরেই গলদঘর্ম্ম হ'য়ে গেলেন, আর পারি না বলে বসে পড়লেন। খানিক বসে আবার কুড়ুল চালাতে লাগলেন, কোপ গায়ে ভাল বসল না, হাত ব্যথা করতে লাগল, আবার বসে পড়লেন, এইভাবে একবার বসেন আবার উঠে কুড়ুল পাড়েন, এই রকমে সারাদিন কেটে গেল, গাছ কাটা আর হ'ল না।

আর পারি না বলে বসে পড়লেন।

সর্দ্দার মজুরদের কাজ দেখে খুব খুসী হ'ল, আর রাগে খোকনের দুই গালে দুই চড় মেরে বল্লে,—"তুই কোন কাজের নোস্, তোর মোটা পেটটাই সার।"

তাদের আহারের বন্দোবস্ত বেশ ভাল রকমই হ'ল,—ভাত, ডাল, তরি তরকারি, আর খোকনের বেলায় কেবল নুন ও ভাত। যে খোকন বাড়ীতে মাছ, মাংস, পোলাও, কারি, কোপ্তা মুখে দিয়ে থুথু করে ফেলে দিতেন, আজ সমস্ত দিন খাটুনির পর পেটের জ্বালায় সর্দ্দার প্রদত্ত কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত কেবল নুন দিয়েই শেষ ক'রে ফেল্লেন, একটা ভাতও পড়ে রইল না।

ছ মাসের মধ্যে খোকনের অনেক পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ভুঁড়ি শুকিয়ে পাত হ'য়ে গেল, মাংসল দেহ দৃঢ় হ'ল। এখন আর কাজে ভয় পান না। সর্দ্দার যখন যে কাজ দেয়, খোকন সে কাজ এক নিমেষে ক'রে ফেলেন, পরিশ্রমকে পরিশ্রম ব'লে জ্ঞান করেন না, পূর্ব্বে কাজের গাফিলতির জন্যে সর্দ্দারের কাছে নিত্যই প্রহার লাভ হ'ত, এখন সর্দ্দার তাঁকে আদর ক'রে মাছ, মাংস খেতে দেয়।

খোকনের দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্ত্তন ঘটল। যে খোকন এক সময়ে দরিদ্রদিগের হৃষ্ট ও বলিষ্ঠ দেহ দেখে হিংসায় মরে যেতেন, ঘৃণায় মুখ বাঁকাতেন, এখন সেই গরীব মজুরেরা তাঁর কণ্ঠহার স্বরূপ হ'ল। উঠতে—বস্তে, চল্তে—ফিরতে, গাল-গল্পে

তাঁর সঙ্গের সাথী হ'ল; এখন আর গরীবদের ওপর পূর্ব্বের সে হিংসা ও ঘৃণাভাব নাই।

খোকন ভাবেন,—"এই যে ধন-সম্পদ, যার অধীনে থেকে মানুষ আপনাকে অতি গর্ব্বিত মনে করে, এ ধন-সম্পদে মানুষকে সুখী করে না, মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোলে না বরং তাকে অধঃপাতেই নিয়ে যায়,—ধর্ম্ম-কর্ম্ম হ'তে দূরে নিয়ে যায়। অর্থই যে সর্ব্ব অনিষ্টের মূল, এটা আগে বুঝতাম না, এখন সব বুঝছি, কেননা এই অর্থ হতেই আমার যত অনিষ্ট হয়েছিল, যত কুসঙ্গ এসে জুটেছিল। পাপ কাজ করতে, পাপ পঙ্কে ডুবাতে, দেহ-মন-প্রাণ কলুষিত করতে এমন বৈরী আর দ্বিতীয় নাই। দেহের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে মনের ও প্রাণের সুখ-স্বচ্ছন্দতা যে আসে এটা একবারও ভাবতাম না। তাই মোসাহেবদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে মেতে কত সুখ মনে করতাম; কিন্তু সে সুখ যে দেহের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নরকের দিকে নিয়ে যাচ্চে, তা একবারও মনে স্থান পেত না।"

মতি নামে প্রৌঢ় বয়স্ক একজন কয়েদী কারাগারের সকলের নিকট রহস্যস্বরূপ ছিল। শিশুর মত সরল মুক্ত উদার, মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, ফুলের মত কোমল, বজ্রের ন্যায় কঠোর, দিবসের প্রথম রবির ন্যায় পবিত্র তাহার প্রাণ, সে এমন কি দোষ করল, যাতে কারাভোগ করতে হ'ল? হায়! মানুষের রাজ্যে এমনি মহাভুল কতই না ঘটছে। অথচ আশ্চর্য্য, এমন কুৎসিত স্থানে থেকে তা'র মনে কোন রকম বিকার এল না, সঙ্গীরা যাতে ভবিষ্যতে সদ্ভাবে জীবন যাপন করে, সেই বিষয়ে নানারূপ সুন্দর সুন্দর গল্প করে তা'দিগকে উপদেশ দিত। খোকন সুবিধা পেলে মতির সহিত নানারূপ সৎকথায় সময় কাটাত। এ বন্দী অবস্থাতেও সরল ও ধার্ম্মিক মতির সঙ্গসুখে খোকন আপনাকে ধন্য বিবেচনা করতে লাগলেন।

খোকনের মুখে দ্বীপে আগমনের সমস্ত কথা শুনে মতি ভাবত,—"কেন এমন হ'ল? যে লোক গরীবের ওপর হাড়ে চটা, যাদের ছায়া মাড়াতে একেবারেই নারাজ, সেই খোকনবাবু কিনা আজ আমাদের মত গরীব মজুরদের ওপর সদয়। তবে ত এই মানুষই সব,—এই মানুষই দেবতা, এই মানুষই দানব। লীলাময় ভগবানের রাজত্বে কোন্ সূত্রে কখন কা'র কি মনের গতি বদলায় তা বুঝা ভার।" এই সকল ভাবতে ভাবতে মতির দু চোখ জলে ভরে যেত।

একদিন সমস্ত দিনের খাটুনির পর আহারাদি শেষে, খোকন ও মতি উভয়ে নির্জ্জন নদী-সৈকতে বসে দুজনার মনের কথা কচ্ছিল। দু-চার কথার পর, মতি বল্লে,—কেন খোকনবাবু, এ বন বাদাড় আপনার ভাল লাগবে কেন? আমরা গরীব চাষী, চাষ-বাস ক'রে

খাই, না আছে চাল, না আছে চুলো, ছু বেলা ভাত জোটে কি না জোটে, আমাদের ভাল লাগতে পারে, কিন্তু আপনার ত তা নয়; আপনি টাকার গাদায় বসে থাকেন, যখন যা হুকুম করেন, তখন তাই হয়, যখন যা খেতে চান তাই পান, আপনার এ জায়গা ভাল লাগচে কেন খোকন বাবু?"

"দেখ মতি, বাড়ীতে আমার বন্ধু-বান্ধব অনেক। প্রতি কথায় তুড়ি দিতে, প্রতি কথায় হেসে গড়াগড়ি খেতে, অন্যায়কে ন্যায় বলতে অনেকে আছে বটে, কিন্তু ছঃখের কথা বলব কি, তারাই আমার মাথাটা খেয়েছে! ঝোপ বুঝে কোপ মেরে ছুহাতে টাকা লুটেচে, আমি শুনেও শুনিনি, দেখেও দেখিনি। টাকার দেমাকেই পৃথিবীকে সরাখানা দেখতাম। তার ওপর ঐ সব সঙ্গী কেমন তা বুঝতেই পারছ, এক একজন কতবড় স্বার্থপর! ওরা বেশ বুঝেছিল, আমার মন যুগিয়ে কথা না বল্লে, আমায় অধঃপাতে নিয়ে যেতে না পারলে ওদের কার্য্যসিদ্ধি হ'বে না, ছু পয়সা লুঠতে পারবে না। তাই তারা আমায় খেলার পুতুল ক'রে রেখেছিল, কিন্তু মঙ্গলময় ভগবান আমায় রক্ষা করলেন, এই দ্বীপে পাঠিয়ে ভালই করলেন। তা না হ'লে আমার দশা যে কি হ'ত তা বলবার নয়। কিন্তু ভগবান তোমায় কেন বিনা দোষে এ কষ্ট দিচ্চেন তা ত বুঝতে পারলুম না।

"এখন বেশ মনে হচ্চে, ছোট-বড় বলে কিছু নাই। ভাল-মন্দ কাজের ভেতর দিয়ে, ধর্ম্ম-কর্ম্মের ভেতর দিয়ে মানুষ ছোট ও বড় হয়, সে বড় ঘরে জন্মালেও হয় না, আর ছোট ঘরে জন্মালেও হয় না। তার সাক্ষী এই দেখ না কেন, তুমি মূর্খ চাষা, তোমার ভেতরে সরলতা, অমায়িকতা, ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাস যতটা আছে, আমাতে কি তা আছে? তোমার তুলনায় কিছুই নাই। এই যে আমি এত ভাল হ'য়েছি, আমার পূর্ব্বের পশুভাব ঘুচে গিয়ে মানুষ হ'য়ে গড়ে উঠেছি, এ সবেরই মূল তুমি,—শুধু তুমি কেন, তোমার মত শ্রমজীবীদের প্রতি আমার এতদূর শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মেছে যে, এখান থেকে মুক্তি পেলেই চাষ-বাস, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে আমার সব সম্পত্তি সৎকর্ম্মে ব্যয় করব এই পণ করেছি।"

মতি আবেগভরে বলতে লাগল,—"খোকনবাবু, আমি অতি নীচ নরাধম, আমায় এমন করে বাড়াবেন না, আমি আপনার পায়ের ধুলোর যোগ্য নই। আমার মত অপদার্থকে আপনি যেরূপ ভালবাসেন, আমাদের যে চক্ষে দেখেন, সে সব কথা মনে হ'লে আপনাকে মানুষ বলে মনে হয় না, দেবতা ব'লে মনে হয়। আমি আপনার কি করেছি, আপনিই আমাদের মানুষ ক'রে তুলেছেন, আপনার—"

মতির কণ্ঠরোধ হইল, আর কথা বলবার শক্তি রইল না, অজস্র অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত হ'তে লাগল।

* * * * * *

এক বৎসর পূর্ণ হ'লে রাজার আদেশে খোকন ও মতিকে দ্বীপ হ'তে রাজ-সমক্ষে আনীত হ'ল। খোকনের শান্ত মূর্ত্তি দর্শন করে রাজা সাতিশয় পুলকিত হলেন। নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—"খোকন, তুমি এক্ষণে অকর্ম্মণ্য শ্রমবিমুখ ধনী, ও স্বাস্থ্যবান্ শ্রমশীল দরিদ্রের স্বাস্থ্যসুখ উভয়ের কত পার্থক্য তা হৃদয়ঙ্গম করেছ কি?"

রাজাকে অভিবাদন ক'রে নতশিরে খোকন বল্লেন,—"হাঁ মহারাজ! করেছি।"

"গরীবদের ওপর রাগটা গেছে কি?"

খোকন বালকের ন্যায় কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন,—"রাজা মহাশয়! আমায় ও-কথা ব'লে আর লজ্জা দেবেন না। গরীবের মধ্যে যে এত বহুমূল্য রত্ন থাকতে পারে তা আমি জানতাম না, এখন মতির সৎ প্রকৃতির গুণে ভালরূপ জেনেছি। প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে কখন গরীবের ওপর অত্যাচার করা দূরে থাকুক, তাদের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের চিন্তামাত্র করব না।"

"তোমার এ রকম পরিবর্ত্তন কেন হ'ল বলতে পার কি?"

"আপনার দূরদৃষ্টি ও মতির সৎ প্রকৃতিই ইহার কারণ।"

মতি করযোড়ে বলতে লাগল,—"ধর্ম্মাবতার! আমি অতি দীন-হীন, কাঙাল, আমি কি করেছি! বরং খোকন বাবুই আমায় মানুষ ক'রে গড়ে তুলেছেন! এঁটো পাত স্বর্গে যেতে বসেছে! এটা কি আমার কম সৌভাগ্য। উনি যে ধনের মানুষ, যে উঁচুকুলে ওনার জন্ম, উনি হেন লোক এ নীচকে যেরূপ ভালবাসেন, যে চক্ষে দেখেন, তা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। দেবতা না হ'লে মানুষ কখন আমার মত নীচকে ভালবাসতে পারেন না। বলব কি মহারাজ, ঐ খোকন বাবুই আমার জ্ঞানদাতা, শিক্ষাদাতা। আমার অপবিত্র জীবন পবিত্র করতে, প্রাণে বিমল শান্তি দিতে, উনি ভিন্ন আর কেহ পারেন নাই।"

মতি বালকের ন্যায় কাঁদতে লাগল। মতির চোখে যত না জল, খোকনের চোখে আরো জল গড়াতে লাগ্‌লো। রাজা দুজনের ভাব ও ভালবাসা দেখে মুগ্ধ হলেন।

রাজা সভাস্থ সকলকে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন,—"ভদ্রমহোদয়গণ! আজ আমি আপনাদিগকে কারাগার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। সকলেই জানেন কারাগার

দোষী ব্যক্তির শাস্তিভোগ করবার স্থান। কিন্তু যে কারাগারে কেবল দোষী ব্যক্তিকে শাস্তিভোগ করতে হয় এবং তার দোষ সংশোধন করবার কোন আয়োজন করা না হয়,—সে কারাগার নিরর্থক। অথচ আশ্চর্য্য এই, এই নিরর্থক কারাগারই প্রায় সকল দেশে দেখতে পাওয়া যায়। এজন্য কারাগারকে সংশোধনাগার ক'রে তোলবার জন্যে আমি অনেক দিন হ'তে মনের মধ্যে ঐ ইচ্ছা পোষণ ক'রে রেখেছিলুম। সেই উদ্দেশ্য খোকন ও মতির দ্বারা সফলতা লাভ করেছে।

এই খোকনের পিতা ধার্ম্মিক, পরোপকারী ও উন্নতমনা ছিলেন। তাঁর পুত্রের এরূপ হীন প্রবৃত্তি কিসে হ'ল তার কারণ জানলুম, খোকন কতকগুলো বদ্‌লোকের সঙ্গে জুটে চরিত্রহীন হ'য়েছে। ভাল লোকের সঙ্গে থেকে সৎ উপদেশে সৎপথে ফেরে কি না তা দেখবার জন্যে সরলমতি মতির সংসারের সকল ভার নিয়ে তাকে ঐ সঙ্গে দ্বীপে পাঠিয়েছিলুম। কারণ এটা প্রায় দেখা যায় সাধারণতঃ লোকের মনে একদিন না একদিন তার কৃত দুষ্কর্ম্মের জন্যে অনুতাপ আসে। সেই অনুতাপের সময় যদি সে সৎসঙ্গ পায়, তা হলে তার অসৎ প্রকৃতি বদলাতে থাকে। এখানেও তাই ঘটেচে। অনুশোচনার সময়, মতির সৎমনের স্পর্শ পেয়ে সে চরিত্র গঠন করতে পেরেচে।”

রাজা সাহ্লাদে খোকনকে মুক্তি দিয়ে সভা ভঙ্গ করলেন।

আজ কৃষক, তাঁতি, কুমোর, কামার প্রভৃতি সকলেই খোকন বাবুর অর্থের সাহায্যে বিপুল উৎসাহে দেশের কাজে লেগে গেছে। কৃষক হলচালনায়, তাঁতি তাঁত চালনায়, কুমোর চাক চালনায়, কামার হাতুড়ি চালনায় এবং অন্যান্য শিল্পীরা তাদের স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে ক্ষুদ্র গ্রামটিকে মুখরিত করে তুলেছে। খোকনের এখন আর পূর্ব্বের সে দাম্ভিকতা, সে অলসতা নাই। তিনি এখন দ্বিগুণ উৎসাহে দেশের উপকারে লেগে গেছেন। দেশে দেশে ঘুরে ফিরে ধনীদিগকে উৎসাহিত ক'রে, অতুল সুখ সাগরে ভাসছেন।

অনেকদিন আগে উজ্জয়িনী নগরে বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজা ছিলেন। তখনকার বড় বড় ন'জন পণ্ডিত নিয়ে তিনি একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেই সভার নাম "নবরত্ন সভা"। এই সভায় নানা বিষয় আলোচনা হ'ত। যিনি তর্কে জয়লাভ করতেন, রাজা তাঁকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন।

এমনি একটা তর্ক সভায় হঠাৎ চুরিবিদ্যার কথা উঠল। একজন সভাসদ্ বলে উঠলেন,—"চুরিবিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।"

মহারাজ বললেন,—"বেশ যদি পড়ে ধরা।"

—"যদি পড়ে ধরা, বলতে কইতে পারলে সে যায় না ক মারা।"

রাজা আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন,—"এ কি কালিদাস, তুমি কবি, মহাকবি, কল্পলোকের অধিবাসী, সৌন্দর্য্য বিলাসী, তোমার মুখ থেকে এরূপ উত্তর আশা করতে পারা যায় না। এ যে একেবারে পাকা চোরের কথা!"

সভায় আর একজন কবি ছিলেন। তিনি কালিদাসের মত অত মধুর কবিতা লিখতে পারতেন না—তাই কালিদাসকে মনে মনে হিংসা করতেন। ভাবতেন,—কালিদাস খোসামোদ

ক'রেই বড় হয়েছে বই ত নয়। তাই তিনি সুযোগ পেলেই সভামাঝে কালিদাসকে অপদস্থ করতে ছাড়তেন না। তিনি বললেন,—"হয়ত, কবি কালিদাস কাব্যের আড়ালে চুরিবিদ্যার চর্চ্চা করেন। তা' না হ'লে—"

কালিদাস বাধা দিয়ে সহাস্যে বললেন,—"তা-না হ'লে, এমন কথা বলবই বা কেন?"

মহারাজ বিক্রমাদিত্য বললেন,—"কিন্তু আমার বিচারে এ পর্য্যন্ত কোন চোর তার কথার জোরে মুক্তি পেয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না।"

কালিদাস বললেন,—"এত দিন তা হ'তে পারে, কিন্তু মহারাজের সে বিশ্বাস আমি ভেঙ্গে দিতে পারি।"

মহারাজ আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন,—"কে,—তুমি?"

কালিদাস বললেন,—"সে যে কে? তা আমি প্রকাশ করতে চাই না।"

রাজা বললেন,—"ভাল, সেই চোর-চূড়ামণির সঙ্গে তোমার কি বিশেষ পরিচয় আছে?"

কালিদাস উত্তর দিলেন,—"নিশ্চয়ই, বলতে গেলে তিনি আর আমি একাত্মা।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন,—"তাকে কি কখনও আমার কাছে বিচারের জন্য পাঠান হয়নি?"

কালিদাস একটু হেসে বললেন,—"না মহারাজ।"

রাজা দম্ভ করে বললেন,—"বেশ, সে যে কতখানি পাকা চোর, তা আমি দেখতে চাই। একটা পরীক্ষা করা হোক। আজ থেকে এক মাসের মধ্যে আমার এই গলার হার তোমার সেই চোর-চূড়ামণি চুরি ক'রে যদি ধরা পড়ে, এবং তার কথার জোরে যদি সে মুক্তি পায়, তা হ'লে তুমি লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে, নতুবা—"

কালিদাস একটু মুচকি হেসে বললেন,—"নতুবা আমায় ফাঁসি যেতে হবে।"

রাজা বিক্রমাদিত্য আশ্চর্য্য হয়ে বললেন,—"একি কবি, তোমার প্রাণে কি ভয় নেই?"

কালিদাস সদর্পে বললেন,—"ভয়! কিসের ভয়! যারা চুরিবিদ্যা জানে না, তারাই ভয় পাবে।"

রাজা বললেন,—"তাই হোক!"

* * * * * *

সেই দিন থেকে রাজা খুব সাবধানে থাকতেন। সমস্ত কাজ যথা নিয়মে চলতে লাগল—কোনটারই ত্রুটী রইল'না।

একদিন রাত্রে মন্ত্রণার পর সকলে চলে গেলে রাজা একাকী মন্ত্রণাগৃহে গভীর চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন। দ্বারে যে প্রহরী পাহারা দিচ্ছিল, সে ঘুমের ঘোরে ঢুলছিল। সেই সুযোগে একটী চোর ঘরের মধ্যে ঢুকে, আস্তে আস্তে রাজার গলা থেকে হার চুরি ক'রে, একটা অস্বাভাবিক শব্দ ক'রে পালিয়ে গেল।

সেই শব্দে প্রহরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চারিদিকে চেয়ে দেখল, কেউ কোথাও নেই। তখন আবার ঢুলতে লাগল।

রাজারও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। গলায় হাত দিয়ে দেখেন, হার নেই। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, প্রহরীকে হারের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। প্রহরীর চক্ষু স্থির; সে কিছুই বলতে পারল না, হতবুদ্ধির মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে রাজার দিকে চেয়ে রইল।

প্রহরীর চক্ষু স্থির; সে কিছুই বলতে পারল না

রাজা ভাবলেন—এমন সতর্ক পাহারা থাকতেও ঘরে ঢুকে তাঁর গলার হার খুলে নেয়, এত সাহস কার! বাইরের চোরের এমন সাহস হবে না। এ কোন বিশ্বাসী লোকের কাজ। প্রহরীই এই হার নিয়েছে।

রাজা প্রহরীকে অনেক ধমকালেন, অনেক মারধর করলেন—কিন্তু তার মুখ থেকে কোন কথাই বেরুল না। কান্নাকাটি সার হ'ল, চোরের সন্ধান মিলল না। রাজা শেষে রেগে বললেন,—"দু মাসের মধ্যে তুই যদি হার খুঁজে বার করতে না পারিস, তা হ'লে তোকে ফাঁসি দেব।"

প্রহরীর মাথা ঘুরে গেল—চারদিক অন্ধকার দেখল। কি যে করবে, কিছুই ঠিক করতে পারল না। চোর ধরবার জন্য পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগল। যেখানে সেখানে, এমন কি চোরের আড্ডায় ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াল। এদিকে দিনগুলো যেন হু হু ক'রে কেটে যাচ্ছে, দুমাস প্রায় শেষ হ'য়ে এল, তবু চোরের কোনো খোঁজ খবর নেই।

ক্লান্ত দেহে একদিন প্রহরী নদীতীরে একটা গাছের তলায় এসে বসল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। প্রহরীর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। মানুষের সকল কষ্ট যিনি দূর করেন, সেই করুণাময় ভগবানের নিকট সে প্রার্থনা করতে লাগল।

এমন সময় অবিকল সেই বিকৃত শব্দ প্রহরীর কানে আসায় সে চমকে উঠল। শব্দ লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে সে একটী লোককে দেখতে পেল। তাকেই চোর মনে ক'রে রাজার কাছে ধ'রে নিয়ে এল।

রাজা চোরকে দেখে বিস্মিত হ'লেন। চোর আর কেউ নয়, স্বয়ং মহাকবি কালিদাস। পণ্ডিত কালিদাসকে প্রহরী খুবই চিন্‌ত; কিন্তু তা হ'লে কি হয়, সে প্রাণের দায়ে সেই বিকৃত শব্দ অনুসরণ ক'রে যাকে পেয়েছে, তাকেই ধ'রে এনেছে। পথে অন্ধকারে কালিদাসকে চিনতে পারেনি। তাই রাজার নিকট ধ'রে এনে যখন তাঁকে চিন্‌ল, তখন প্রহরী ক্ষোভে, দুঃখে ও লজ্জায় একবার রাজার পায়ে আর একবার কালিদাসের পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল। কালিদাস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কোমলতাগুণে ক্ষমা করলেন বটে, কিন্তু রাজা প্রহরীকে ছাড়লেন না, ক্রোধে গর্জ্জন করে বললেন,—"তুই বেটা কি অন্ধ! কেন এই জগদ্বিখ্যাত মহাকবি কালিদাসকে চোর ব'লে ধ'রে আন্‌লি বল?"

প্রহরী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল,—"মহারাজ, আমি চোরকে দেখিনি,—তবে আপনার ঘর থেকে পালাবার সময় সে যে বিকৃত শব্দ করে, তা' আমার কানে এখনও লেগে আছে। এমন অদ্ভুত শব্দ আগে কখনও শুনিনি। আজ নদীর ধারে ক্লান্ত হ'য়ে একটী গাছতলায় বসেছিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল, নদীতীর নির্জ্জন হ'ল। হঠাৎ আমার খুব নিকটে সেই শব্দ শুনলাম। প্রাণের দায়ে দৌড়ে গিয়ে যাকে আমি দেখতে পাই—তাকেই আপনার কাছে ধরে এনেছি—এই আমার অপরাধ।

রাজা মহাসমস্যায় পড়লেন। মহাকবি কালিদাস তাঁর গলার হার চুরি করেছেন, এ তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। কি আশ্চর্য্য! নবরত্নের শ্রেষ্ঠরত্ন কালিদাস আজ একটা সামান্য প্রহরীর হাতে চোর ব'লে ধরা পড়লেন,—এতে যেন তাঁর মান-মর্য্যাদা অতল সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করা হ'ল। মানীর কাছে প্রাণের চেয়েও মান-সম্ভ্রমই বড়, তা' এই সামান্য প্রহরী একবারও বুঝল না। নাঃ, ওটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে কুকুরকে খাওয়ালেও রাগ যায় না।

রাগে রাজার দুই চোখ লাল হয়ে উঠল, তিনি চীৎকার করে বললেন,—"কে আছিস্ রে! ওটাকে পাতাল ঘরে পূরে রাখ।"

কারারক্ষক রাজার আদেশ পেয়েই ছুটে এল। প্রহরীর প্রাণের আশা আর নেই। যাকে সে চোর ব'লে ধ'রে আনল, ভাগ্যদোষে তিনি হলেন কবি কালিদাস। তবে কি তার শোনবার ভুল হয়েছে ?

আবার সেই শব্দ! নাঃ, এবারে কোন ভুল নয়! প্রহরী পাগলের মত ছুটে গিয়ে কালিদাসকে সজোরে চেপে ধরল।

উত্তেজনায় প্রহরীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। চীৎকার করে বলে উঠল,—"চোর! চোর!"

রাজা অবাক্ হয়ে গেলেন। তবে কি সত্যই কালিদাস চোর! চোর যদি না হবে, প্রহরী তবে তাকে ছু'ছুবার ধরবে কেন! নাঃ, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে, এদের দুজনকেই আটক রাখতে হবে

ওটাকে পাতাল ঘরে পূরে রাখ।

রাজার আদেশে কালিদাস ও প্রহরী সেদিনকার মত বন্দী হল।

তার পরের দিন। কালিদাস রাজার গলার হার চুরি করা অপরাধে ধরা পড়েছেন, আজ তাঁর বিচার। চারদিকে এই কথা ছড়িয়ে পড়ল। কত লোক যে এল তা গোণা যায় না।

বিচারসভায় তিল ধারণের স্থান নেই। বত্রিশ-সিংহাসনে রাজা সভা আলো করে বসে আছেন। তাঁর ডান দিকে যত বড় বড় পণ্ডিত, আর বাঁ দিকে বড় বড় রাজকর্ম্মচারী। সম্মুখে জন-সমুদ্র। কালিদাস ও প্রহরীকে রাজার সম্মুখে নিয়ে আসা হ'ল।

রাজা কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি চুরির বিষয় কিছু জান ?"

কালিদাস বললেন,—"জানাজানি কি মহারাজ, আপনি যখন সামান্য একটা প্রহরীর

কথায় আমায় কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, তখন আমি আপনার গলার হার চুরি করলেও চোর, না করলেও চোর।”

কালিদাসের যুক্তিপূর্ণ কথায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একবাক্যে অনুযোগ করলেন,—“মহারাজ, আপনি দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হ’য়ে, ন্যায়বিচারক হ’য়ে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকে এভাবে অপমানিত করা আপনার পক্ষে শোভা পায় না। কালিদাস চুরি করেছেন এই যদি আপনার বিশ্বাস; এবং সে বিশ্বাস যদি ঐ সামান্য একটা ভৃত্যের কথায় জন্মে থাকে, তা হ’লেও কালিদাসকে দোষী সাব্যস্ত করা অত্যন্ত অন্যায় ও অসঙ্গত হয়েছে।”

পণ্ডিতদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন,—“শুধু তাই নয়, আপনি বিনাদোষে কবিকে চোর অপবাদ দিয়ে, তাঁর বিশ্বব্যাপী সম্মান নষ্ট করেছেন।”

লজ্জায় রাজা মাথা নত করলেন। অতি বিষণ্ণ বদনে উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে আহ্বান ক’রে বলতে লাগলেন,—“সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমি এমন একটা জটিল সমস্যায় পড়েছি, যা’ আমার জীবনে কখন ঘটেনি। আমি জানি, কালিদাস উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন; তিনি নবরত্ন সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন, সরস্বতীর বরপুত্র। এঁর দ্বারা চুরি হতে পারে না, তাহা যেমন আপনারা বুঝছেন, তেমনি আমিও বুঝি। কিন্তু আর একটা দিক্ আছে। আমার এই প্রহরী কখনও এমন কোন কাজ করেনি, যা’তে আমি তাকে বিশ্বাসঘাতক বলতে পারি। তার সঙ্গী প্রহরীরা তার বিশ্বাসপরায়ণতার যথেষ্ট প্রশংসা করে এবং আমিও করি। সে ইচ্ছা করলে যে কোন লোককে ধরে আনতে পারত, যাতে তার দণ্ড রহিত হয়; কিন্তু তা’ সে করেনি। অথচ যে মুহূর্ত্তে সে জানল, যাঁকে সে চোর বলে ধ’রে এনেছে তিনি বিশ্বকবি কালিদাস, তখন সে লজ্জিত হ’য়ে কাতরভাবে ক্ষমা চেয়েছিল। কিন্তু কালিদাস আমার সামনে বিকৃত শব্দ করাতে প্রহরী তাঁকে চোর ব’লে জড়িয়ে ধরল। প্রহরী ত জানে, কালিদাস আমার কাছে কত প্রিয়, তবুও সে জেনে শুনে কালিদাসকে চোর ব’লে ঠিক করল কেন? এটা একটা সমস্যা! এ অবস্থায় আমি উভয়কেই কারাগারে দিলাম। তবে এটা ঠিক, যখন হার চুরি যায়, প্রহরী ব্যতীত সে অস্বাভাবিক শব্দ আর কেহ শোনেনি। সেইজন্য অভিযুক্ত প্রহরী ভিন্ন দ্বিতীয় কোন সাক্ষী নেই। উপযুক্ত প্রমাণ না থাকাতে কালিদাসের মুক্তি সঙ্গত। এখন প্রহরীর সম্বন্ধে অভিযোগ এই—তাকে আদেশ করা হয়েছিল যে, যদি সে প্রকৃত চোর ধরতে না পারে, তবে তাকেই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। অতএব, আপনাদের সর্ব্বসমক্ষে এই প্রহরীর প্রাণদণ্ড ও কালিদাসের মুক্তি ঘোষণা করছি।”

আমি আপনার কণ্ঠহার চুরি করেছি—এই দেখুন সেই হার !

জল্লাদ ফাঁসির দড়ি প্রহরীর গলায় পরিয়ে দিল ; কেবল ঝুলিয়ে দিতে বাকী। প্রহরীর স্ত্রী আর তার ছোট ছোট পুত্রকন্যাদের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে সকলের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল। কালিদাস তখন ফাঁসি বন্ধ রাখতে রাজাকে অনুরোধ করলেন। তাঁর মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন,—"মহারাজ, আমিই চোর, আমিই আপনার কণ্ঠহার চুরি করেছি—এই দেখুন সেই হার। আপনার বোধ হয় মনে আছে, একদিন নবরত্ন সভায় কথা উঠেছিল, 'চুরিবিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।' আমি এতে আর একটি চরণ যোগ করেছিলাম, 'যদি পড়ে ধরা, বলতে কইতে পারলে সে যায় নাক মারা।' সেই কথা সত্য কিনা তার প্রমাণ আজ দেখিয়ে দিলাম। দেখুন, প্রহরী আমাকে দু দুবার চোর বলে ধরল, কিন্তু কথার জোরে আমি নির্দ্দোষ প্রমাণিত হলাম। চোরের শাস্তি নির্দ্দোষ প্রহরীর উপর পড়ল। অতএব, মহারাজ, আমি আপনার কথা অনুসারে লক্ষ টাকা পুরস্কার পেতে পারি কি না,—এটা বিচার করে দেখুন?"

মহারাজ বললেন,—"কিন্তু কালিদাস তুমি যে চুরি করবে এ রকম ত কথা ছিল না।"

কালিদাস একটু হেসে বললেন,—"মহারাজ, আপনার স্মরণ আছে যে, আমি বলেছিলাম, সেই চোর-চূড়ামণি আর আমি একাত্মা। বলুন, আমার চুরি করা অন্যায় হয়েছে?"

সভার মধ্যে হাসির রোল উঠল।

কালিদাস বলতে লাগলেন,—"মহারাজ, মানুষের কাছে কে দোষী ও কে নির্দ্দোষী ইহার বিচার সঠিক হতে পারে না। দোষী ব্যক্তি দোষ ক'রেও এমন কতকগুলি প্রমাণ দেখাতে পারে, যাতে স্বতঃই তাকে নির্দ্দোষ বলে ভ্রম হয়; যে নির্দ্দোষ সে যদি উপযুক্ত প্রমাণ দিতে অপারগ হয়, তাহ'লে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়। আবার সমাজের মধ্যে যিনি সম্মান লাভ করেছেন, তিনি যে কোন দোষ করতে পারেন—এ যেন কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।"

মহারাজ বিক্রমাদিত্য সমবেত জনমণ্ডলীকে আহ্বান ক'রে বলতে লাগলেন,—"কবি যা' বলেছেন, তা খুবই সত্য। তিনি অঙ্গীকৃত লক্ষ টাকা পুরস্কারের যথার্থ অধিকারী। কিন্তু প্রহরীকে ক্ষমার পাত্র ব'লে মনে করা যেতে পারে না; কারণ পাহারা দিবার সময় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল—তার জন্য তার শাস্তি হওয়া উচিত। তবে আগেই তাকে যা শাস্তি দিয়েছি, তাই যথেষ্ট। এখন তাকে মুক্তি দিলাম।"

প্রজারা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে তা দেখবার জন্যে এক রাজা ছদ্মবেশে তাঁর রাজ্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন ভোর বেলায় কান্নার শব্দ শুনে একটু অগ্রসর হ'য়ে তিনি দেখলেন, এক গৃহস্থের বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোক কাঁদছে। রাজার ভারী কষ্ট হ'ল কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ী ব'লে তিনি আর ভিতরে প্রবেশ করলেন না। বাহিরে থেকেই তাদের নাম ধাম জেনে নিয়ে ফিরে এলেন।

পরদিন সেই বণিক্ স্বামী-স্ত্রীর ডাক পড়ল। দুজনে রাজার সম্মুখে এসে যোড় হাতে দাঁড়াল। রাজা বণিক্কে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি তোমার স্ত্রীকে কাল রাত্রে অত মারছিলে কেন ?"

বণিক্ বলল,—"মহারাজ, ওর স্বভাব বড় মন্দ। আমাকে ও কিল চড় মারে। আমিও তাই চুপ ক'রে থাকতে পারি না।"

রাজা রেগে বললেন,—"স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচারের শাস্তি কি জান ?"

—"জানি মহারাজ, কিন্তু আমার আর বরদাস্ত হয় না,—অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।"

রাজা তখন বণিক্-পত্নীকে স্নেহস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—"বল ত মা, তুমি কি কারণে স্বামীকে কিলচড় মার ?"

বণিকের স্ত্রী লজ্জায় মাথা হেঁট করে বলল,—"মহারাজ, স্ত্রী হ'য়ে কি কেউ কখন স্বামীকে মারে ?"

রাজা তুষ্ট হয়ে বল্লেন,—"তবে কি তোমার স্বামীর কথা মিথ্যা ?"

বণিকের স্ত্রী বল্লে,—"না, ওঁর কথা সত্য। তবে আমি জেনে শুনে মারিনি। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে হাত ছুঁড়ি, তাইতেই ওঁর গায়ে লাগে।"

—"মা, তুমি যে স্বপ্নের ঘোরে হাত ছোঁড়, সে কথা স্বামীকে বললেই ত সব মিটে যেত।"

বণিকের পত্নী কোন কথাই কইল না, মাটির দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বুঝলেন যে সে স্বামীকে স্বপ্নের কথা কিছুই বলেনি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—"স্বামীকে বল নি কেন ? বলতে কোন বাধা ছিল কি ?"

সে বলল,— "মহারাজ, স্বপ্নটা এমন কিছু নয় যে বলা যায় না। তবে স্বামীকে বলিনি, এইজন্য যে তিনি আমার কোন কথাই বিশ্বাস করেন না; তাই মার খেয়েও চুপ ক'রে থাকি।"

রাজা বললেন,—"কি স্বপ্ন দেখ, আমাকে বলতে পার ?"

বণিক্‌পত্নী একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল,—"মহারাজ, আমি প্রায়ই রাত্রে তিনটি স্বপ্ন দেখি। এই স্বপ্নে অন্ধকারের মত একটি মূর্ত্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। এসেই আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। আমি যা বলি সে ঠিক তার উল্টো বলে। আমিও রাগ সামলাতে না পেরে তাকে মেরে বসি। তাতেই স্বামীর গায়ে হাত লাগে।"

—"প্রথম স্বপ্নে কি ঝগড়া হয় ?"

আমি বলি,—"অর্থলোভ বড় ভয়ানক। অত্যন্ত ধার্ম্মিকও সকল সময় এই লোভ সম্বরণ করতে পারে না। সে তা' না মেনে আমার সঙ্গে কেবলই ঝগড়া করে। তাই রাগে তার গায়ে হাত উঠে পড়ে।"

রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নেড়ে বললেন,—"আচ্ছা, তার পরের স্বপ্ন ?"

—"দ্বিতীয় স্বপ্ন এই যে, আমি বলি, লোকে অর্থেরই সম্মান করে। খুব সম্মানী লোকও হঠাৎ অর্থহীন হ'য়ে পড়লে তাকে কেউ গ্রাহ্য করে না। এমন কি তার অতি নিকট আত্মীয়ও ঘৃণায় তাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে। এতে তার প্রবল আপত্তি।"

এই দুই স্বপ্নের ভেতরে গভীর নীতি লুকান আছে দেখে রাজা ভারি খুসী হলেন, বল্লেন,—"বেশ, তারপর, তৃতীয় স্বপ্ন ?"

—"তৃতীয় স্বপ্নে আমি বলি, পূর্ব্ব পরিচয় না থাকলেও বন্ধু হওয়া যায়। সে তাতে প্রতিবাদ করে।"

রাজা তখন বণিক্‌কে ডেকে বললেন,—"দেখ, তোমার স্ত্রীর মুখে যা শুনলুম, তাতে কি বিচার করব, কিছুই ঠিক করতে পারছি না। ছ মাস পরে তোমাদের ডেকে পাঠাবো। তবে তুমি তোমার স্ত্রীকে আর কখনো মেরো না। তা হ'লে ভয়ানক শাস্তি পাবে।"

রাজা বণিক্‌-পত্নীর অদ্ভুত স্বপ্নের কথা কেবলই ভাবেন। শেষে স্বপ্নগুলিকে নিজেই একবার পরীক্ষা করে দেখবেন স্থির করে তিনি মন্ত্রীর উপর রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে বহু অর্থ ও মণি-মুক্তা নিয়ে ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বেরুলেন। এদিকে বৃদ্ধ মন্ত্রী আদেশমত চারিদিকে রটিয়ে দিলেন যে রাজা পাগল হ'য়ে বিবাগী হয়েছেন।
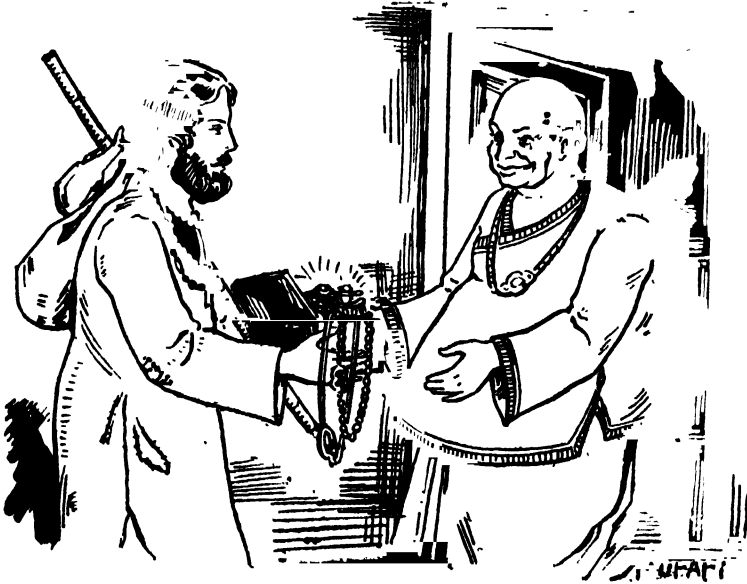
তার কাছে কতক মণিমুক্তা গচ্ছিত রাখলেন।

কয়েক দিন ভ্রমণের পরে রাজা এক স্থানে এসে শুনলেন, সেখানে এক ধনী বাস করে, সে অত্যন্ত ধার্ম্মিক। ধর্ম্মকথা ভিন্ন অন্য কথা মুখে আনে না। রাজা তাকেই উপযুক্ত ভেবে, তার কাছে কতক মণিমুক্তা গচ্ছিত রাখলেন। তারপর তিনি তাঁর সহোদরা ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আর এক দেশে গমন করলেন।

অল্প দিনেই রাজা মলিন বেশে পাগলের মত ভগ্নীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। দরোয়ান রাজাকে ভিখারী মনে ক'রে তাড়া দিল। রাজা তাড়া খেয়েও নড়লেন না। ভগিনীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। বাড়ীর ভিতরে সে খবর গেল। ভাই পাগল হ'য়ে বিবাগী হয়েছেন এ কথা তাঁহার ভগিনী আগেই জেনেছিলেন। সেই পাগল আজ তাঁরই বাড়ীতে! এ ত বড় বিপদ! ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে তিনি বল্লেন,—"এ আবার কোথাকার পাপ এসে

হুকুম দিলেন,—"ওটাকে আমাদের আস্তাবলের একধারে রেখে মুড়ি মুড়কি কিনে খেতে দাওগে। আর পাগলটা যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় স্পষ্ট বলে দেবে,—তোমার ভগিনী তোমার সঙ্গে দেখা করবেন না বলেছেন।"

রাজা আস্তাবলেই আশ্রয় নিলেন। মুড়ি মুড়কিগুলোকে আস্তাবলের এক কোণে পুঁতে রেখে তিনি বাজারের খাবার খেয়ে সাত দিন কাটালেন। রোজই তিনি ভগিনীর সঙ্গে দেখা করতে চান, জেদ করেন, কিন্তু কিছুতেই দেখা হয় না। প্রাসাদের মধ্যে তাঁকে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ল না এক দিনও। রাজা বণিক্-পত্নীর স্বপ্নের মধ্যে লুকানো গভীর নীতি উপলব্ধি ক'রে সেই দেশ ত্যাগ করলেন।

রাজা আবার ভ্রমণ করতে লাগলেন। বহুদিন ধরে বহু দেশ দেখে একদিন সন্ধ্যায় তিনি এক বনের ধারে এসে উপস্থিত হলেন। নিকটে লোকালয়ের চিহ্নও দেখা গেল না। রাত্রির মত কোথায় যে আশ্রয় নেবেন তা স্থির করতে পারলেন না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে তিনি একটি প্রকাণ্ড গাছের নীচে ব'সে পড়লেন। সারাদিনের পথশ্রমে তাঁর তন্দ্রা আসছিল।

হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই তিনি দেখলেন অনেকগুলি ভীষণাকার লোক তাঁর অর্থ ও মণিমুক্তা অপহরণ করছে। রাজা তাদের বাধা দিতে গেলেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই একটি লাঠির আঘাত তাঁর মাথার উপর পড়তেই তিনি জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়লেন। রক্তে সেখানকার মাটি রাঙা হ'য়ে উঠল।

কিছু পরেই একটী দরিদ্র কৃষক সেই পথে যাচ্ছিল। সে ছদ্মবেশী রাজাকে ঐ অবস্থায় দেখে তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেল।

কৃষক ও কৃষকের স্ত্রী তাঁকে অত্যন্ত সেবা-যত্ন করতে লাগল। ক্রমেই রাজার মাথার আঘাত সেরে এল। কৃষকের কুঁড়েঘরে তিনি পরম সুখে বাস করতে লাগলেন।

কৃষকের পুত্রটি তাঁর সঙ্গে খেলা করত। তিনিও তাকে নিয়ে কত বেড়াতেন। অল্প দিনেই তাঁর আঘাত একেবারে সেরে গেল। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন। তখন একদিন তিনি কৃষকের পুত্রকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। বলে গেলেন তাঁদের ফিরতে তিন চার দিন লাগবে। তারা যেন না ভাবে। কৃষক ও কৃষক-পত্নী রাজাকে খুব বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করত। তাই তারা কিছু বলল না।

রাজা আস্তাবলেই আশ্রয় নিলেন।

চার দিন পরে তিনি কৃষক-পুত্রকে নিয়ে ফিরে এলেন। সকলে দেখে ত অবাক। কৃষকের ছেলে রাজপুত্রের মত দামী পোষাক প'রে, কত সব মূল্যবান জিনিস নিয়ে প্রকাণ্ড এক গাড়ী থেকে ছদ্মবেশী রাজার হাত ধ'রে নামছে।

রাজা তারপর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে গচ্ছিত রত্ন আদায়ের জন্য ধনীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ধনী তাঁর কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল, বলল,—"সে কি হে?"

ধনীর মূর্ত্তি দেখেই রাজা বুঝে নিলেন যে, সে লোভে পড়েছে, দেবার মন নাই। তবুও তিনি বললেন,—"মহাশয়, আপনি ধার্ম্মিক ও ধনী, আপনার মত লোকের এ সামান্য রত্নে লোভ করা উচিত কি? আপনি জেনে শুনে আমার গচ্ছিত রত্ন দিচ্ছেন না কেন? বেশ জানবেন আমার এ ধন নিয়ে আপনি কখনই সুখী হ'তে পারবেন না।"

ছদ্মবেশী রাজার হাত ধ'রে নামছে।

ধনী ত রেগেই আগুন।

—"কী, এত বড় স্পর্দ্ধা! আমারই বাড়ীতে বসে আমাকেই চোর বলা! কে আছিস্ রে? এটাকে ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বের ক'রে দেত!"

রাজা আর কোন কথা না বলে সেখান থেকে একেবারে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন।

মন্ত্রী রটিয়ে দিলেন, রাজা আরোগ্য লাভ করে দেশে ফিরেছেন। রাজ্যময় আবার আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

রাজা ফিরে এসেই ধনীকে ডাকতে লোক পাঠিয়ে দিলেন। প্রচুর উপহার নিয়ে বহু লোক কৃষক-পরিবারকে নিমন্ত্রণ করতে গেল। ছয় মাসও ইতিমধ্যে পূর্ণ হ'ল। রাজা আবার সভায় বসলেন। বণিক্ ও বণিক্-পত্নী এল। ধনীও এল। সে রাজাকে চিনতে পেরে পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করল। রাজা তার নিকট থেকে তাঁর গচ্ছিত রত্নের চার গুণ আদায় ক'রে বণিক্-পত্নীকে সেই অর্থ পুরস্কার দিলেন। তারপর সভামধ্যে বণিক্-পত্নীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত ও নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে নীতিগুলি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন।

ছোট্ট রাজ্যে মস্ত বড় এক রাজা ছিলেন।

রাজবাড়ীতে চাকর-বাকর, লোকজন চারদিকে গিজ্ গিজ্ করছে। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, উটশালে উট সবই আছে। একজন বড় রাজার যা না থাকে তাও আছে।

রাজার সবই ভাল—কেবল কান-পাতলা। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করেন। রাজ্যের যত বাজে অকেজো জিনিসগুলি ছু'গুণ তিনগুণ দাম দিয়ে কিনে রাজকোষ শূন্য হ'বার উপক্রম হয়েছে। রাজা বুঝেও যেন বোঝেন না, দেখেও যেন দেখেন না।

বিদেশী বণিক্‌রা রাজাকে এসে হয় ত বলল,—"মহারাজ, এই জিনিসটা আপনার কেনা দরকার,—কেননা অমুক দেশের রাজার এ রকম একশটা জিনিস আছে—অমুক দেশের রাজার হাজারটা আছে, আপনার যদি একটাও না থাকে, সেটা এ রাজ্যের অপমান।" এমনি ক'রে বিদেশী বণিক্‌রা বাজে জিনিসগুলো রাজাকে গছিয়ে দেয়। রাজাও নিজের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্য বাধ্য হয়ে কেনেন। আর রাজবাড়ীর লোকেরা ঝোপ বুঝে কোপ মারে। বণিকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে বেশ ছু' পয়সা উপরি উপায় করে।

রাণী কিন্তু রাজার মত নহেন। তিনি রাজাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে দেন—কিন্তু তা হ'লে কি হবে—রাণী যখন বোঝান, তখন রাজাও বেশ বোঝেন, তারপর যেমনকার তেমনি।
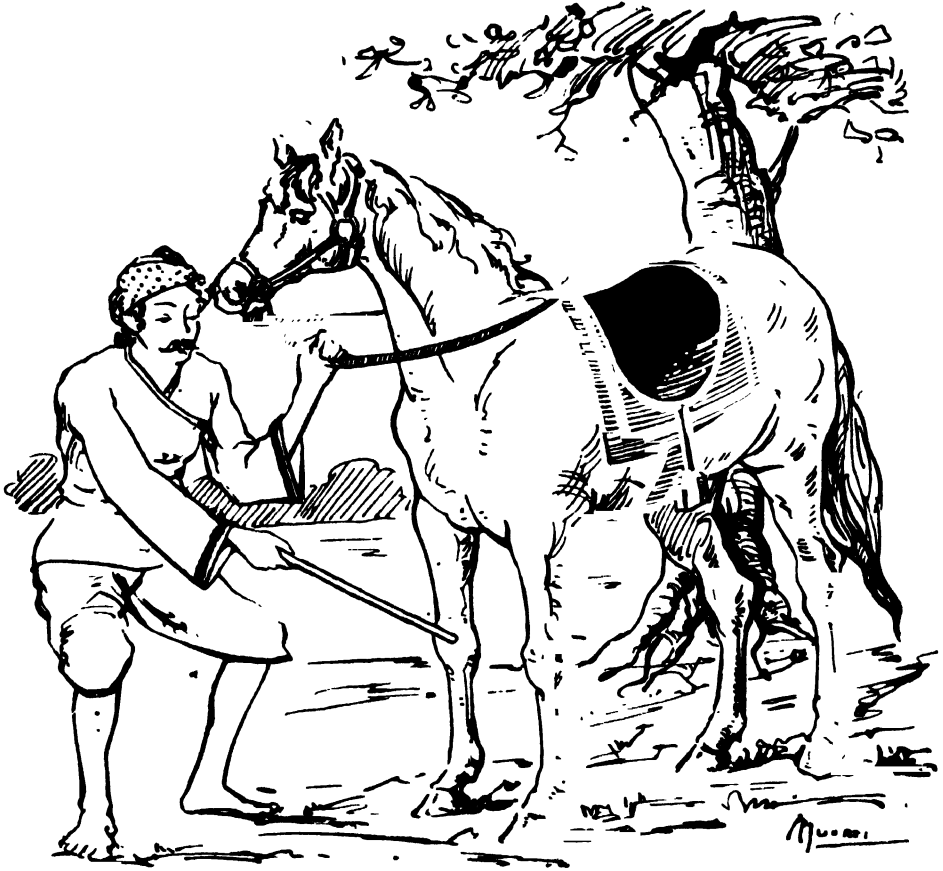
একটি কাঠি দিয়ে আস্তে আস্তে আঘাত করল

এমনি ক'রে দিন কাটে। একদিন রাজার শ্বশুরের রাজ্য থেকে একজন লোক এল। তার না আছে চালচলন, না আছে বেশভূষা, না আছে কথাবার্ত্তার কায়দা। কিন্তু লোকটাকে ভাল মানুষ বলতে হবে, সাত চড়ে মুখে রা নাই। রাজার তাকে' পছন্দ না হ'লেও শ্বশুর

মহাশয় যখন পাঠিয়েছেন, সেইজন্য বাধ্য হয়ে বললেন,—"উপস্থিত মাহিনার বন্দোবস্ত কিছু হবে না, কেবল দু'বেলা খেতে পাবে, এতে রাজি হও ত থাক, নইলে পথ দেখ।"

লোকটা রাজার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে সম্মত হ'ল।

লোকটির নাম গণপতি শর্ম্মা। তার সঙ্গে যে আলাপ পরিচয় করেছে—সে বুঝেছে—বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানে এ রাজ্যে তার তুলনা নাই। মামলা, মকর্দ্দমা, আচার বিচার, আরও কত কারণে তার কাছে লোকজন আসতে লাগল—সকলকেই যুক্তি ও পরামর্শ দিয়ে কার্য্যোদ্ধার করে দিতে লাগল। যার এত গুণ সে যে কেন রাজার কাছে পেটভাতায় থাকতে রাজি হ'ল, ইহাই আশ্চর্য্য!

গণপতি শর্ম্মা রাজসভায় নিজের স্থানটিতে বসে থাকে।

একদিন এক বণিক্ রাজার কাছে একটি ঘোড়া নিয়ে এল। ঘোড়াটি দেখে রাজার খুব পছন্দ। দর ঠিক হ'ল। রাজার অশ্বপালক এসে ঘোড়া দেখে ভালই বলল। টাকা দেবার সময় রাজার হঠাৎ গণপতি শর্ম্মার কথা মনে পড়ল। কতলোক তার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে আসে, দেখাই যাক না, এতে কি পরামর্শ দেয়?

রাজা নিজে যেন ঘোড়া খুব চেনেন, এই আস্ফালন ক'রে বললেন,—"কেমন হে, দশ হাজার টাকায় ঘোড়াটা খুব সস্তা হবে না?"

গণপতি শর্ম্মা বলল,—"মহারাজ, যার তার কথায় ও ঘোড়া কিনবেন না—ঘোড়াটার পিছনের ডান দিকের পায়ে বাত আছে।"

রাজা কিন্তু ভারি রেগে গেলেন,—"বলিস্ কি রে গর্দ্দভ, আমি কি যার তার কথায় অত টাকা খরচ ক'রে বেতো ঘোড়া কিনব? ঘোড়া চিনবে কারা? যারা ঘোড়ায় চড়ে, তারা বেশী চিনবে, না, যারা চড়ে নি, কেবল মাত্র চোখে দেখেছে, তারা বেশী চিন্‌বে?"

বণিক্ বলল,—"আর, মহারাজের যিনি প্রধান অশ্বপালক তিনিও ঘোড়াকে ছুটিয়ে আপনার সম্মুখে দেখিয়ে দিলেন। কই ঘোড়া ত একবারও খোঁড়াল না?"

তখন গণপতি শর্ম্মা ধীরে ধীরে ঘোড়াটির কাছে গেল। বেতো পা ছাড়া অন্য পায়ে একটি কাঠি দিয়ে আস্তে আস্তে আঘাত করল, ঘোড়া কিছুই করল না। কিন্তু বেতো পায়ে কাঠিটি লাগা মাত্র ঘোড়া খুঁড়িয়ে খানিকটা সরে গেল। তারপর আচমকা লাগামটি ধরে ছোটাতেই, তার দোষ ধরা পড়ল। রাজা ঘোড়াটি কিনলেন না। তিনি এবার

গণপতির উপর খুসী হলেন, ভাত আর শাক চচ্চড়ি ছাড়াও কিছু তরকারি আর মাছের ব্যবস্থা করে দিলেন।

এর মাঝখানটা ফাটা জুড়ে বেদাগ করা হয়েছে।

কিছুদিন পরে এক জহুরী একটা হীরের আংটি রাজাকে বিক্রয় করতে এল। দাম, তার পঞ্চাশ হাজার টাকা।

আংটি দেখে সকলের খুব পছন্দ। রাজা ভাবলেন, সবাই এত ভাল বলছে, এখন গণপতি মূর্খটা কি বলে শুনি! তিনি গণপতিকে ডেকে তার মত জিজ্ঞাসা করলেন। গণপতি আংটিটা হাতে নিয়ে বেশ ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে রাজাকে বলল,—"এটার দাম দু'শো টাকার বেশী নয়। এর মাঝখানটা ফাটা জুড়ে বেদাগ করা হয়েছে।"

রাজা শুনেই অবাক্। জহুরী কিন্তু আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল—হাজার হোক, ব্যবসাদার ত—ঘাড় মুখ বেঁকিয়ে বলল,—"বলেন কি মশায়, আমি এই ব্যবসা করে মাথার চুল পাকালাম, আমার চোখে ফাটা ধরা পড়ল না। আপনি হীরের কি বোঝেন, যে এই বেদাগ হীরেটাকে ফাটা বলে দিলেন।"

গণপতি তখন চাকরকে দিয়ে তার ঘর থেকে একটা বাক্স আনাল। তারপর একটা আরক বের ক'রে হীরের উপর লাগাতেই, হীরের উপরের মশলাটা ধুয়ে গিয়ে ফাটা বেরিয়ে পড়ল। জহুরীর মুখে আর কথা নাই। আংটি নিয়ে সে সরে পড়ল। এমন হাতে নাতে ধরা পড়বে সে আশা করেনি।

রাজা গণপতির উপর ভারী সন্তুষ্ট হলেন। আর একটু হলেই পঞ্চাশ হাজার টাকা জলে গিয়েছিল আর কি! লোকটা বাঁচিয়ে দিলে ত! রাজা তাকে ভালরকম পুরস্কার দেবেন স্থির করলেন। কিন্তু সভাসদ্ নানা কথায় গণপতির দোষ দেখাতে লাগল; বুঝিয়ে দিল যে আসলে গণপতি লোকটা কিছুই নয়। একটা মস্ত বড় ধাপ্পাবাজ মাত্র। রাজা ভাবলেন অসম্ভব নয়! তিনি হুকুম দিলেন,—"আচ্ছা, তবে একে দু'বেলা একটু ক'রে দুধ খেতে দিও।"

যুবরাজের বিয়ে। দেশ বিদেশে ঘটকরা সুন্দরী ও সুলক্ষণা রাজকন্যা খুঁজতে বেরুল। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের কন্যাকে তারা পছন্দ করে এল। রাজা একদিন খুব ধুমধাম করে মেয়ে দেখতে গেলেন। গণপতিও রাজার সঙ্গে চলল।

রাজকন্যাকে সভায় আনা হ'ল। অসামান্য তার রূপ। অশেষ গুণবতী ও সুলক্ষণা তার মুখ দেখেই তা বোঝা যায়। সকলেরই খুব পছন্দ। কিন্তু গণপতিকে তেমন প্রফুল্ল দেখা গেল না। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তোমার মুখ অমন হ'য়ে গেল কেন? অসুখ করল নাকি?" গণপতি বলল,—"না, মহারাজ, কিন্তু—।" রাজা বললেন,—"আচ্ছা।" রাজা সেদিন কোনোরূপ-পাকা কথা না দিয়ে ফিরে এলেন। পথে গণপতি রাজাকে বলল,

রাজকন্যাকে সভায় আনা হ'ল।

"মহারাজ, রাজকন্যাকে এখন বাহিরে এত পরমা সুন্দরী দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই একটি বিষম রোগে ভুগে তিনি হাবা কালা হয়ে যাবেন, আর এমন রূপও

তাঁর থাকবে না। এই রোগ হবার আগে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তার প্রত্যেকটি প্রকাশ পেয়েছে।”

গণপতির কথা যে রাজা ঠিক বিশ্বাস করলেন তা নয়, তা হ’লেও তিনি ঐ স্থানে আর যুবরাজের বিবাহ দিলেন না।

সভার লোকেরা বলতে লাগল,—“মহারাজ, আপনার এই কাজটা ঠিক হ’ল না। একটা মূর্খের কথায় বিশ্বাস করে আপনি অমন মেয়েটাকে ছেড়ে দিলেন!” তা হ’লেও রাজা যা স্থির করেছেন, তা আর পরিবর্ত্তন করলেন না। সকলে তখন গণপতিকে দূষতে লাগল। ছি, ছি! রাজবংশে অমন সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়েটির নামে হতভাগাটা একটা কলঙ্ক রটিয়ে দিলে। এজন্যে হয় ত আর তার বিয়েই হবে না! আমরা এ ব্যাপার কখনই সহ্য করতাম না। ওটাকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে তবে জলগ্রহণ করতাম।

তিন মাস পরে রাজকন্যার সত্যই এক কঠিন অসুখ হ’ল। অনেক দিন রোগভোগের পর তার বাকশক্তি শ্রবণশক্তি নষ্ট হ’য়ে গেল।

তখন সভাসদ্‌রা বললেন,—“আন্দাজে অমন সবাই বলতে পারে। একটা কি দুটো কথা মিলে গেছে বলে কি, ওর সব কথাই সত্য হবে!”

তাঁদের কথায় রাজা ভাবলেন, বলা যায় না, গণপতির হয় ত সত্যই কোন গুণ নাই, হঠাৎ কয়েকটা কথা মিলে গেছে বলেই আমরা তাকে গুণী মনে করছি। কিন্তু বরাবরই যে তাই হবে তার কোন মানে নাই। আর ওর কথার সত্যতা সম্বন্ধে যদি আমাদের মনের মধ্যে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায়, তা হ’লে সে ত বড় বিপদ্‌জনক হবে। নাঃ, এ লোককে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। তবে একে ছেড়ে দেওয়াও হবে না, কে জানে আবার কার কি করে বসবে? তার চেয়ে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনে দেওয়াই ভাল।

নদীর ও-পারে জঙ্গলের মধ্যে রাজার এক কারাগার ছিল। গণপতি শর্ম্মার সেখানেই যাবজ্জীবন বাসের আদেশ হ’ল।

বহুদিন অতীত হয়েছে। গণপতির কথাও সকলে ভুলে গেছে। চোখের আড়ালে সে থাকে, তার কথা কেউই ভাবে না। কেউই তার খোঁজ করে না।

রাজার একজন জ্ঞাতি শত্রু ছিল। তিনি গণপতি শর্ম্মাকে চিনতেন এবং ভয়ও করতেন। গণপতির সঙ্গে রাজার আর সদ্ভাব নাই শুনে, তিনি রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান ক’রে একখানি চিঠি দিলেন। ঠিক এই সময় রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। রাজসভারই কয়েকজন গণ্য

ব্যক্তি এই বিদ্রোহের অধিনায়ক। তাঁরা ভেবেছিলেন, পরাক্রান্ত শত্রুর নিকট রাজা নিশ্চয়ই পরাজিত হবেন। সুতরাং এখন থেকেই শত্রুকে সাহায্য করলে ভবিষ্যতে তাঁরা অবশ্যই পুরস্কৃত হবেন। রাজা কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারলেন না। একদিকে বিদ্রোহ, আর একদিকে পরাক্রান্ত শত্রু। রাজা মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করলেন, অনেকেই যোগদান করল না। যাঁরা এলেন তাঁরা কেবল মাথা চুলকাতে লাগলেন। কর্ত্তব্য কি তা স্থির হ'ল না। রাজা পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর গণপতিকে মনে পড়ল। সে হয় ত এই বিপদে পথের সন্ধান দিতে পারে। গণপতিকে আনতে তখনই নৌকা পাঠান হ'ল।

গণপতি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে রাজাকে আশ্বাস দিয়ে বলল,—"আপনি উতলা হবেন না। স্মরণ রাখবেন, আপনার শত্রুকে জলপথ দিয়েই আসতে হবে—কারণ স্থলপথে আসার পথ নাই, চারিদিকের দুরতিক্রম্য পর্ব্বত পেরিয়ে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া ও-দিকের সর্ব্বত্রই আপনার সুদৃঢ় দুর্গ আছে।"

ঠিক এই সময়ে সংবাদ এল রণতরীর এক বহর এই দিকেই আসছে। তবে বিকালের পূর্ব্বে তাদের এখানে পৌঁছান সম্ভব নয়। এই সংবাদ এনেছে এক গুপ্তচর, সে কাল রাতে জেলের বেশে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য ক'রতে গিয়েছিল।

গণপতি বলল,—"আপনার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নাই। আকাশের দিকে চাইলেই বুঝতে পারবেন, আজ ভয়ানক ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা। অবশ্য ঝড় উঠলে দুপুরের পরই উঠবে। তবে এটা ঠিক যে ঝড় হওয়ার পূর্ব্বে শত্রুরা এখানে পৌঁছতে পারবে না। এরপর শত্রুদের জয় করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না। আপনি কেবল সমুদ্র তীরের দুর্গগুলিকে সুরক্ষিত করবার ব্যবস্থা করুন। আমার সঙ্গে কিছু সৈন্য দিলে আমিই সমুদ্র তীরের সকল ব্যবস্থা করতে পারব। আপনি ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের দমন করুন। বিদ্রোহীদের দলে যে সকল সৈন্য আছে তাদের হাত করে ফেলুন।"

গণপতি তখনই ঘোষণা করে দিল,—যারা এই বিদ্রোহে যোগ দেবে না, বরং রাজাকে শত্রু-দমনে সাহায্য করবে তাদের প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে এবং তাদের সকল অভাব অভিযোগ মিটিয়ে দেওয়া হবে। অন্যথায় তাদের ভয়ানক শাস্তি পেতে হবে।

এ ঘোষণার ফল ভালই হ'ল। সাধারণ সৈন্যেরা অনেকেই রাজার পক্ষে ফিরে এল।

গণপতি রাজাকে বিদ্রোহ দমনের সকল উপদেশ দিয়ে সৈন্য নিয়ে সমুদ্র তীরে সুব্যবস্থা করতে চলে গেল।

রাজা নিজেই তখন বিদ্রোহীদের ঘাঁটি আক্রমণ করলেন। যে সব সৈন্য ফিরে এসেছিল, তাদের কাছ থেকেই তিনি বিদ্রোহীদের সকল সংবাদ শুনেছিলেন। সামান্য যুদ্ধের এদের কয়েকজন নেতা বন্দী হল। বিদ্রোহ দমন করা তখন তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ উঠল।

এদিকে অনেকক্ষণ হ'ল আকাশ কাল মেঘে ছেয়ে গেছে। চারিদিকে একটা গম্ভীর থম্‌থমে ভাব—প্রলয়ের ইঙ্গিত করছিল। আশঙ্কায় রণতরীগুলি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হ'তে লাগল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ভীষণ ঝড় উঠল। তরীগুলি তখন অনেক নিকটে এসে পড়েছে। কিন্তু আর তারা অগ্রসর হ'তে পারল না। হাল ভেঙে, পাল ছিঁড়ে ঝড় তাদের দিশাহারা করে তুলল।

ঝড় ও সমুদ্রের সে কি নিষ্ঠুর খেলা! ঐ রণতরীগুলি—মানুষের প্রাণ নিয়ে যারা খেলা করে—তারাই এখন তুচ্ছ খেলার সামগ্রী হয়ে উঠেছে!

সমুদ্র শান্ত হলে যে কয়খানি অর্দ্ধভগ্ন রণতরী তীরে এসে লাগল, তাদের তখন আর যুদ্ধ করবার মত অবস্থা নাই। বিনা বাধায় শত্রু সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করল।

বিদ্রোহীদের কয়েকজনকে সামরিক আইন অনুসারে হত্যা করা হ'ল। অপর সকলকে রাজা নির্ব্বাসিত করলেন। শত্রুপক্ষের রাজার কাছ থেকে প্রচুর অর্থ এবং কয়েকটী দুর্গ ও প্রদেশ নিয়ে বন্দীদের মুক্তি দিলেন।

তারপর তাঁর রাজ্য-শাসনের নূতন বন্দোবস্ত হ'ল। নূতন যে মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল—তার নেতৃত্ব গ্রহণ করল গণপতি শর্ম্মা।